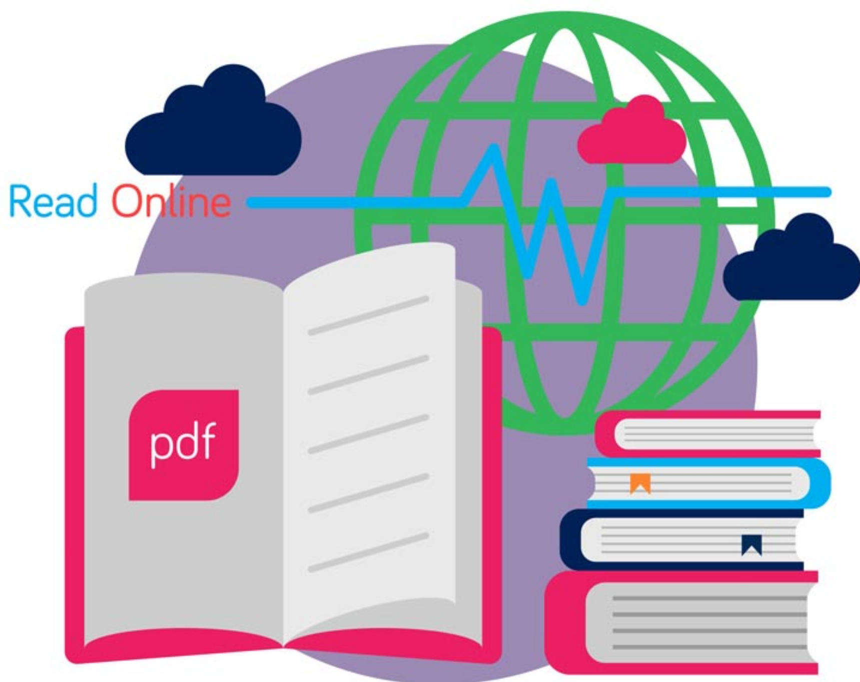
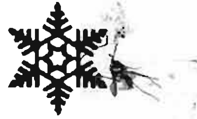

Read Online
pdf



আশ্চর্জন্তু

আগস্ট ৭

আজ এক আশ্চর্য দিন।

সকালে প্রহ্লাদ যখন বাজার থেকে ফিরল, তখন দেখি ওর হাতে একটার জায়গায় দুটো থলি। জিজ্ঞেস করাতে বলল, 'দাঁড়ান বাবু, আগে বাজারের থলিটা রেখে আসি। আপনার জন্য একটা জিনিস আছে, দেখে চমক লাগবে।'

আমার তেত্রিশ বছরের পুরনো প্রৌঢ় চাকর আমাকে চমক দেবার মতো কিছু আনতে পারে ভেবে আমার হাসি পেল। কী এনেছে সে থলিতে করে?

মিনিটখানেকের মধ্যে প্রশ্নের জবাব পেলাম, আর চমক যেটা লাগল সেটা যেমন তেমন নয়, এবং তার মাত্রা অনুমান করা প্রহ্লাদের কর্ম নয়।

থলি থেকে বার করে যে জিনিসটা প্রহ্লাদ আমার হাতে তুলে দিল সেটা একটা জানোয়ার। সাইজে বেড়ালছানার মতো। চেহারার বর্ণনা আমার মতো বৈজ্ঞানিকের পক্ষে এক কথায় দেওয়া সম্ভব নয়। প্রাণিবিদ্যাবিশারদদের মতে পৃথিবীতে আন্দাজ দু'লক্ষ বিভিন্ন শ্রেণীর জানোয়ার আছে। আমি তার বেশ কিছু চোখে দেখেছি, কিছুর ছবি দেখেছি, আর বাকি অধিকাংশেরই বর্ণনা পড়ে জেনেছি তাদের জাত ও চেহারা কীরকম। প্রহ্লাদ আমাকে যে জন্তুটা দিল সেরকম জন্তুর বর্ণনা আমি কখনও পড়িনি। মুখ দেখে বানর শ্রেণীর জানোয়ার বলেই মনে হয়। নাকটা সাধারণ বাঁদরের চেয়ে লম্বা, কপাল বাঁদরের তুলনায় চওড়া, মাথাটা বড় আর মুখের নীচের দিকটা সরু। কান দুটো বেশ বড়, চাপা, এবং উপর দিকটা শেয়াল

কুকুরের কানের মতো ছুঁচোলো। চোখ দুটো মুখের অনুপাতে বড়ই বলতে হবে—যদিও লরিস বাঁদরের মতো বিশাল নয়। পায়ের প্রান্তভাগে থাবার বদলে পাঁচটা করে আঙুল দেখেও বাঁদরের কথাই মনে পড়ে। লেজের একটা আভাসমাত্র আছে। এ ছাড়া, গোঁফ নেই, সারা গায়ে ছোট ছোট লোম, গায়ের রং তামাটে। মোটামুটি চেহারার বর্ণনা হল এই। মাথাটা যে বড় লাগছে, সেটা শৈশব অবস্থা বলে হতে পারে—যদিও শৈশব কথাটা ব্যবহার করলাম আন্দাজে। এমনও হতে পারে যে, এটা একটা পরিণতবয়স্ক জানোয়ার, এবং এর জাতই ছোট।

মোটকথা এ এক বিচিত্র জীব। প্রহ্লাদ বলল, এটা তাকে দিয়েছে জগন্নাথ। জগন্নাথ থাকে উশ্রীর ওপারে ঝল্‌সি গ্রামে। সে নানারকম শিকড় বাকল সংগ্রহ করে গিরিডির বাজারে বেচতে আসে সপ্তাহে দু-তিনবার। আমিও জগন্নাথের কাছ থেকে গাছগাছড়া কিনে আমার ওষুধ তৈরির কাজে লাগিয়েছি। জগন্নাথ জন্তুটাকে পায় জঙ্গলে। সে জানে প্রহ্লাদের মনিবের নানারকম উদ্ভট জিনিসের শখ, তাই সে জানোয়ারটা আমার নাম করেই তাকে দিয়েছে।

'কী খায় জানোয়ার, সে বিষয়ে বলেছে কিছু?'

'বলেছে।'

'কী বলেছে?'

'বলেছে শাকসবজি ফলমূল ডালভাত সবই খায়।'

'যাক, তা হলে তো কোনও চিন্তাই নেই।'

চিন্তা নেই বললাম, কিন্তু এত বড় একটা ঘটনা নিয়ে চিন্তা হবে না সে কী করে হয়? একটা সম্পূর্ণ নতুন জাতের প্রাণী, যার নামধাম স্বভাবচরিত্র কিছুই জানা নেই, যার কোনও উল্লেখ কোনও জন্তু জানোয়ারের বইয়েতে কখনও পাইনি, সেটা এইভাবে আমার হাতে এসে পড়ল, আর তাই নিয়ে চিন্তা হবে না? কেমনতরো জানোয়ার এটা? শান্ত না মিচ্‌কে? কোথায় রাখব একে? খাঁচায়? বাক্সে? বন্দি অবস্থায় না ছাড়া অবস্থায়? একে দেখে আমার বেড়াল নিউটনের প্রতিক্রিয়া কী হবে? অন্য লোকে এমন জানোয়ার দেখলে কী বলবে?...

একে নিয়ে কী করা হবে সেটা ভাবার আগে আমি জন্তুটাকে বেশ কিছুক্ষণ ধরে পর্যবেক্ষণ করলাম। আমার কোল থেকে তুলে নিয়ে টেবিলের উপর রাখলাম ওটাকে। সে দিব্যি চুপচাপ বসে রইল, তার দৃষ্টি সটান আমার দিকে। ভারী অদ্ভুত এ চাহনি। এর আগে কোনও জানোয়ারের মধ্যে দেখেছি বলে মনে পড়ে না। এ চাহনিতে ভয় বা সংশয়ের কোনও চিহ্ন নেই, হিংস্র বা বুনোভাবের লেশমাত্র নেই। এ চাহনি যেন বুঝিয়ে দিচ্ছে যে, আমার উপর তার গভীর বিশ্বাস; আমি যে তার কোনও অনিষ্ট করব না, সেটা সে জানে। এ ছাড়াও চাহনিতে যেটা আছে, সেটাকে বুদ্ধি ছাড়া আর কিছু বলা যায় না। সত্যি করেই জন্তুটা বুদ্ধিমান কি না, তার পরিচয় না পেলেও, তার চোখের মণির দীপ্তিতে স্পষ্ট বোঝা যায় যে, তার মস্তিষ্ক সজাগ। সেই কারণেই সন্দেহ হচ্ছে যে, এ জন্তু হয়তো শাবক নয়। অবিশ্যি এর বয়সের হদিস হয়তো কোনওদিনও পাওয়া যাবে না। যদি দেখি এর আয়তন দিনে দিনে বাড়ছে, তা হলে অবিশ্যি বুঝতে হবে এর বয়স বেশি হতে পারে না।

আজ সকাল সাতটায় এসেছে জন্তুটা আমার কাছে; এখন রাত পৌনে এগারোটা। ইতিমধ্যে পশুসংক্রান্ত যত বই, এনসাইক্লোপিডিয়া ইত্যাদি আছে আমার কাছে, সবগুলো ঘেঁটে দেখেছি। কোনও জন্তুর বর্ণনার সঙ্গে এর সম্পূর্ণ মিল নেই।

সকালেই নিউটনের সঙ্গে জন্তুটার মোলাকাত হয়ে গেছে। আমার কফি খাবার সময় নিউটন আমার কাছে এসে বিস্কুট খায়। আজও এল। জন্তুটা তখনও টেবিলের উপরেই রাখা ছিল। নিউটন সেটাকে দেখেই দরজার মুখে থমকে দাঁড়াল। আমি দেখলাম তার লোম খাড়া হচ্ছে। জন্তুটার মধ্যে কিন্তু কোনও চাঞ্চল্য লক্ষ করলাম না। সে কেবল আমার দিক থেকে

বিড়ালের দিকে দৃষ্টি ফিরিয়েছে। অবিশ্যি এই দৃষ্টির মধ্যে একটা পার্থক্য আছে। খুব অল্পক্ষণের জন্য হলেও, তার মধ্যে একটা সতর্কতার আভাস ফুটে উঠেছে। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই নিউটনের পিঠের লোমগুলো আবার বসে গেল। সে জানোয়ারের দিক থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিয়ে একটা ছোট্ট লাফে আমার কোলে উঠে বিস্কুট খেতে লাগল।

জন্তুটাকে মেপে রেখেছি। নাকের ডগা থেকে লেজের ডগা অবধি সাড়ে ন' ইঞ্চি। এটার ছবিও তুলে রেখেছি বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে। রঙিন ছবি, কাজেই পরে রং পরিবর্তন হলে বুঝতে পারব। খাওয়ার ব্যাপারে আজ আমি যা খেয়েছি তাই খেয়েছে, এবং সেটা বেশ তৃপ্তি সহকারে। আজ বিকেলে একবার আমি ওটাকে সঙ্গে নিয়ে বাগানে বেড়াতে বেরিয়ে ছিলাম। একবার মনে হয়েছিল গলায় একটা বকলস পরিয়ে নিই, কিন্তু শেষপর্যন্ত হাতে করে তুলে নিয়ে গিয়ে ঘাসের উপর ছেড়ে দিলাম। সে আমার পাশেপাশেই হাঁটল। মনে হয় সে এর মধ্যেই বেশ পোষ মেনে গেছে। জন্তুজানোয়ারের সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপন করতে আমার বেশি সময় লাগে না এটা আমি দেখেছি। এর বেলাও সেটা বিশেষভাবে লক্ষ করলাম।

এখন আমি শোবার ঘরে বসে ডায়রি লিখছি। জন্তুটার জন্য একটা প্যাকিংকেসের মধ্যে বিছানা করে দিয়েছি। মিনিটপাঁচেক হল নিজে থেকেই সে বাক্সের মধ্যে ঢুকেছে।

অকস্মাৎ আমার জীবনে এই নতুন সঙ্গীর আবির্ভাবে আমার মন আজ সত্যিই প্রসন্ন।

আগস্ট ২৩

আজ আমার কতকগুলো জরুরি চিঠি এসেছে; সে বিষয় বলার আগে জানিয়ে রাখছি যে, এই ষোলো দিনে আমার জন্তু আয়তনে নিউটনকে ছাড়িয়ে গেছে। সে এখন লম্বায় ষোলো ইঞ্চি। তার স্বভাবচরিত্রেরও কতকগুলো আশ্চর্য দিক প্রকাশ পেয়েছে, সে বিষয় পরে বলছি।

জন্তুটিকে পাবার দু'দিন পরেই তার ছবি সমেত পৃথিবীর তিনজন প্রাণিবিদ্যাবিশারদকে চিঠি লিখে পাঠিয়ে ছিলাম। কীভাবে এটাকে পাওয়া গেল, এবং এর স্বভাবের যেটুকু জানি সেটা লিখে পাঠিয়ে ছিলাম। এই তিনজন হলেন ক্যালিফর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের জন ড্যাভেনপোর্ট, ইংলন্ডের স্যার রিচার্ড ম্যাক্সওয়েল, ও জার্মানির ড. ফ্রিডরিশ একহার্ট। তিনজনেরই উত্তর আজ একসঙ্গে পেয়েছি। ড্যাভেনপোর্ট লিখছেন—বোঝাই যাচ্ছে পুরো ব্যাপারটা একটা ধাপ্পাবাজি; এই নিয়ে তাঁকে যেন আমি আর পত্রাঘাত না করি। ম্যাক্সওয়েল বলছেন, জন্তুটা যে একটা হাইব্রিড তাতে কোনও সন্দেহ নেই। হাইব্রিড হল, দুটি বিভিন্ন জানোয়ারের সংমিশ্রণে উদ্ভূত একটি নতুন জানোয়ার। যেমন ঘোড়া আর গাধা মিলে খচ্চর। ম্যাক্সওয়েল চিঠি শেষ করেছেন এই বলে—'পৃথিবীতে আনকোরা নতুন জানোয়ার আবিষ্কারের সম্ভাবনা নেই বললেই চলে। সমুদ্রগর্ভে কী আছে না আছে তার সব খবর হয়তো আমরা জানি না, কিন্তু ডাঙার প্রাণী সবই আমাদের জানা। তোমার এই জন্তুকে অনেকদিন স্টাডি করা দরকার। এর স্বভাবে তেমন কোনও চমকপ্রদ বৈশিষ্ট্য ধরা পড়লে আমাকে জানাতে পারো।'

ড. একহার্ট হচ্ছেন এই তিনজনের মধ্যে সবচেয়ে খ্যাতিসম্পন্ন। তাঁর চিঠিটা একটু বিশেষ ধরনের বলে সেটা সম্পূর্ণ তুলে দিচ্ছি।

একহার্ট লিখছেন—

প্রিয় প্রোফেসর শঙ্কু,

তোমার চিঠিটা কাল সকালে পেয়ে আমি সারারাত ঘুমোতে পারিনি। তুমি ছাড়া

অন্য কেউ লিখলে আমি সমস্ত ব্যাপারটা প্রতারণা বলে উড়িয়ে দিতাম। কিন্তু তোমার ক্ষেত্রে এ প্রশ্নই ওঠে না। কী আশ্চর্য এক জানোয়ার যে তোমার হাতে এসে পড়েছে সেটা আমি পঞ্চান্ন বছর পশু সম্বন্ধে চর্চা করে বুঝতে পারছি। তোমার তোলা ছবিই এই জানোয়ারের অনন্যসাধারণতা প্রমাণ করে। আমি বৃদ্ধ হয়েছি, তাই তোমার দেশে গিয়ে জানোয়ারটা দেখে আসা সম্ভব হচ্ছে না। কিন্তু একটি বিকল্প ব্যবস্থায় তোমার আপত্তি হবে কি না পত্রপাঠ লিখে জানাও। তুমি যদি এখানে আস তবে তার খরচ বহন করতে আমি রাজি আছি। আমার অতিথি হয়েই থাকবে তুমি। তোমার জানোয়ারের জন্য যথোপযুক্ত ব্যবস্থা আমি করব। আমি আপাতত অসুস্থ, ডাক্তার আমাকে দু'মাস বিশ্রাম নিতে বলেছে। যদি নভেম্বর মাসে আসতে পার তা হলে খুব ভাল হয়। আমি তোমার সঙ্গে যথাসময়ে যোগাযোগ করব—অবিশ্যি যদি জানি যে, তোমার পক্ষে আসা সম্ভব হচ্ছে।

আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা গ্রহণ করো।

ইতি

ফ্রিডরিশ এক্‌হার্ট

আমি এঁকে জানিয়ে দেব যে, আমার যাবার ইচ্ছে আছে—অবিশ্যি যদি আমার জন্তু বহাল তবিয়তে থাকে।

এবার জন্তুটার বিষয় বলি।

ক'দিন থেকেই লক্ষ করছি জন্তুটা আর আমার সামনে চুপচাপ বসে থাকে না। আমার সঙ্গ সে পরিত্যাগ করে না ঠিকই, কিন্তু তার মধ্যে যেন একটা স্বাধীন মনোভাব এসেছে। আমি যখন পড়ি বা লিখি তখন সে সারা ঘরময় নিঃশব্দে ঘোরাফেরা করে। মনে হয় ঘরের জিনিসপত্র সম্বন্ধে তার বিশেষ কৌতূহল। আলমারির বই, ফুলদানির ফুল, টেবিলের উপর কাগজকলম দোয়াত টেলিফোন—সব কিছু সম্পর্কে তার অনুসন্ধিৎসা। এতদিন সে ঘুরে ঘুরে বেড়িয়ে দেখেই সন্তুষ্ট ছিল, আজ হঠাৎ দেখি চেয়ার থেকে টেবিলে উঠে সে আমার ফাউনটেনপেনটা হাতে নিয়ে নেড়েচেড়ে দেখছে। এই নাড়াচাড়ার মধ্যে একটা বিশেষত্ব লক্ষ করলাম। তার বুড়োআঙুল কাজ করে মানুষ বা বাঁদরের মতোই। ডাল আঁকড়ে ধরে গাছে চড়ে খাদ্য সংগ্রহ করতে হবে বলে বানরশ্রেণীর জানোয়ারের এই কেজো বুড়ো আঙুলের উদ্ভব হয়েছিল। একেও জঙ্গলে থেকে গাছে চড়তে হয়েছে সেটা বুঝতে পারলাম।

এ ছাড়া আরেকটা লক্ষ করার জিনিস হল—সে কলমটা দেখছে দু'পায়ে দাঁড়িয়ে। বানরশ্রেণীর মধ্যে এক ওরাংওটাং, ও সময় সময় শিম্পাঞ্জিকে, কিছুক্ষণের জন্য দাঁড়িয়ে হাঁটতে দেখা যায়। গোরিলা দু'পায়ে দাঁড়িয়ে বুকে চাপড় মারে বটে, কিন্তু সেই পর্যন্তই। আমার জন্তু কিন্তু দাঁড়িয়ে রইল বেশ কিছুক্ষণ ধরে।

তারপর দাঁড়ানো অবস্থাতেই হাত বাড়িয়ে একটা কাগজ টেনে নিয়ে কলমটা দিয়ে তার উপর হিজিবিজি কাটতে শুরু করল। আমার চল্লিশ বছরের পুরনো অতি প্রিয় ওয়াটারম্যান কলম; পাছে তার নিবটা এই জন্তুর হাতে পড়ে নষ্ট হয়ে যায় তাই বাধ্য হয়ে সেটাকে উদ্ধার করার উদ্দেশ্যে সোফা ছেড়ে উঠে এগিয়ে গেলাম। জন্তু যেন আমার উদ্দেশ্য অনুমান করেই হাত বাড়িয়ে কলমটা আমার হাতে দিয়ে দিল।

এই ঘটনা থেকে তিনটে নতুন কথা জানতে পারলাম জন্তুটা সম্পর্কে।

১) তার বুড়ো আঙুল মানুষ বা বাঁদরের মতো কাজ করে।

২) সে দু'পায়ে দাঁড়িয়ে থাকতে পারে বাঁদরের চেয়ে বেশিক্ষণ।

৩) তার বুদ্ধি বানরশ্রেণীর বুদ্ধিকে অনেকদূর অতিক্রম করে যায়।

আরও কত কী যে শিখব এই বিচিত্র জানোয়ারটিকে স্টাডি করে তা কে জানে?

সেপ্টেম্বর ২

জন্তুটা এ কদিনে আরও তিন ইঞ্চি বেড়েছে। এখন এর আয়তন মোটামুটি একটা মাঝারি সাইজের কুকুরের মতো। অথবা বছর চারেকের মানুষের বাচ্চার মতো। এটা বলছি, কারণ জন্তুটা এখন প্রায়ই দু'পায়ে হাঁটে, হাতে করে খাবার তুলে মুখে পোরে, দু'হাতে গেলাস ধরে দুধ খায়। শুধু তাই নয়, ওকে আর মাঠে নিয়ে যেতে হয় না। ও আমার বাথরুম ব্যবহার করে। গত সপ্তাহে ওর জন্যে কয়েকটা রঙিন পেন্টুলুন করিয়েছি। সেগুলো পরতে ও কোনও আপত্তি করেনি। আজ তো দেখলাম নিজেই পা গলিয়ে পরার চেষ্টা করছে।

আরও একটা বিশেষত্ব লক্ষ করছি। সেটা হল, ঘরে কথাবার্তা হলে ও অতি মনোযোগ দিয়ে শোনে। শোনার সময় তার ভুরু কুঁচকে যায়—সেটা কনসেনট্রেশনের লক্ষণ। আমি জানি এটা অন্য কোনও জানোয়ারের মধ্যে দেখা যায় না। এটা বিশেষ করে লক্ষ করছিলাম যখন কাল অবিনাশবাবুর সঙ্গে কথা বলছিলাম।

অবিনাশবাবু আমার প্রতিবেশী এবং বহুকালের আলাপী। এই একটি ভদ্রলোককে দেখলাম যিনি আমাকে কোনওরকম আমল দেন না। বা আমার কাজ সম্বন্ধে কোনও কৌতূহল প্রকাশ করেন না। জন্তুটাকে দেখে তিনি ভুরু ঈষৎ কপালে তুলে কেবল বললেন, 'এটা আবার কী বস্তু?'

আমি বললাম, 'এটি একটি আনকোরা নতুন শ্রেণীর জানোয়ার। এর নাম ইয়ে।'

অবিনাশবাবু চুপ করে চেয়ে আছেন আমার দিকে। তারপর বললেন, 'কী হল—মনে পড়ছে না নামটা?'

'বললাম তো—ইয়ে।'

'ইয়ে?'

'ইয়ে। সেটা বাংলা ইয়েও হতে পারে, আবার ইংরিজি E.A. অর্থাৎ একস্ট্রর্ডিনারি অ্যানিম্যালও হতে পারে।

ইয়ে নামটা আমি গতকালই স্থির করেছি। ইয়ে বলে দু-একবার ডেকেও দেখেছি। সঙ্গে সঙ্গে মাথা ঘোরানো থেকে মনে হয় সে ডাকে সাড়া দিচ্ছে।

'বাঃ, বেশ নাম হয়েছে,' বললেন অবিনাশবাবু, 'কিন্তু এ কিছু করবে টরবে না তো?'

জন্তুটা অবিনাশবাবুর দিকে এগিয়ে গিয়ে ভদ্রলোকের বাঁ হাতের কবজিটা ধরে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে রিস্টওয়াচটা দেখছিল। আমি বললাম, 'আপনি কিছু না করলে নিশ্চয়ই করবে না।'

'হুঁ...তা এটাকে কি এখানেই রাখবেন, না জু গার্ডেনে দিয়ে দেবেন?'

'আপাতত এখানেই রাখব। এবং আপনাকে একটা অনুরোধ করব।'

'কী?'

'আমার এই নতুন সম্পত্তিটি সম্বন্ধে দয়া করে কাউকে কিছু বলবেন না।'

'কেন?'—অবিনাশবাবুর দৃষ্টিতে কৌতুকের আভাস—'যদি বলি আপনি একটি ইয়ে সংগ্রহ করেছেন তাতে দোষটা কী? ইয়েটা যে কী সেটা না বললেই হল!'

'এটা চলতে পারে।'

প্রহ্লাদ কফি এনে দিয়েছে, ইয়ে সোফায় ঠেস দিয়ে বসে ঠিক আমাদেরই মতো কাপের হাতলে ডান হাতের তর্জনী গলিয়ে দিয়ে সেটা মুখের সামনে ধরে চুমুক দিয়ে কফি খাচ্ছে।



এই অবাক দৃশ্য দেখেও অবিনাশবাবুর একমাত্র মন্তব্য হল, 'বোঝো!'
একটা মানুষের বিস্ময়বোধ বলে কোনও বস্তু নেই, এটা ভাবতে অবাক লাগে।

সেপ্টেম্বর ৪

আজ এক আশ্চর্য ঘটনা ইয়ে সম্পর্কে আমার এতদিনের ধারণা তছনছ করে দিয়েছে।

দুপুরে আমার পড়ার ঘরে বসে সদ্য ডাকে আসা 'নেচার' পত্রিকার পাতা উলটে দেখছিলাম। ইয়ে আমার পাশের সোফাতে বসে একটা কাচের পেপারওয়েটে চোখ লাগিয়ে সেটা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখছিল। এরই মধ্যে সে যে কখন ঘর থেকে বেরিয়ে গেছে টের পাইনি। হঠাৎ আমার ল্যাবরেটরি থেকে একটা বাক্স উলটে পড়ার শব্দ পেয়ে ব্যস্তভাবে উঠে গিয়ে এক ভয়াবহ দৃশ্য দেখে কিছুক্ষণের জন্য চিন্তাশক্তি হারিয়ে ফেললাম।

বর্ষার সময় আমার বাগানে মাঝে মাঝে সাপ বেরোয়, সেটা আমি জানি। তারই একটা বোধ হয় বারান্দা দিয়ে আমার ল্যাবরেটরিতে ঢুকেছিল। যে সে সাপ নয়, একেবারে গোখরো। সেই সাপ দেখি এখন ইয়ের কবলে পড়েছে। সাপের গলায় দাঁত বসিয়ে আমার জন্তু তাকে ধরেছে মরণকামড়ে। আর সেইসঙ্গে সাপের লেজের আছড়ানি সে রোধ করেছে সামনের দু'পা দিয়ে।

ঘটনাটা চলল এক মিনিটের বেশি নয়। কারণ এই আসুরিক আক্রমণ যে সাপকে সহজেই পরাস্ত করবে, তাতে আশ্চর্যের কিছু নেই।

থেঁতলানো, মরা সাপটাকে ছেড়ে দিয়ে এবার ইয়ে পিছিয়ে এল। বিজয়গর্বে তার দ্রুত নিশ্বাস পড়ছে, সেটা আমি ঘরের বিপরীত দিক থেকে শুনতে পাচ্ছি।

কিন্তু আশ্চর্য এই যে, ইয়ের দাঁত আমি আগে পরীক্ষা করেছি; সে দাঁত দিয়ে এ-কাজটা অসম্ভব। কারণ মাংসাশী জানোয়ারের তীক্ষ্ণ শ্ব-দন্ত বা কুকুরে-দাঁত ইয়ের ছিল না।

আর সাপের দেহ যেরকম ক্ষতবিক্ষত হয়েছে, সে কাজটা করার মতো তীক্ষ্ণ নখ—যাকে ইংরেজিতে বলে 'ক্ল'—সেও এ জন্তুর ছিল না।

প্রহ্লাদকে ডেকে সাপটা ফেলে দিতে বলে আমি ইয়ের দিকে এগিয়ে গেলাম।

'ইয়ে, তোমার মুখটা হাঁ করো তো দেখি।'

বাধ্য ছেলের মতো এই আশ্চর্য জন্তু এককথায় আমার আদেশ পালন করল।

না। এমন দাঁত তো আগে ছিল না, হঠাৎ এর আবির্ভাব হল কী করে?

চার পায়ের বিশটা আঙুলে যে তীক্ষ্ণ নখ এখন দেখলাম, সে নখও আগে ছিল না।

কিন্তু বিস্ময়ের শেষ এখানেই নয়।

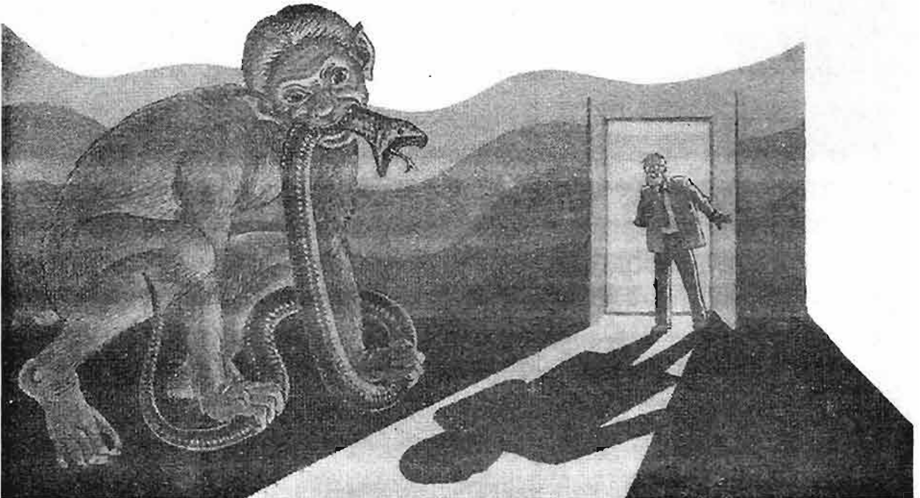
দশ মিনিটের মধ্যে নখ ও দাঁত আবার স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে এল।

পশুবিজ্ঞান এই রহস্যের কোনও কিনারা করতে পারে কি? মনে তো হয় না।

নভেম্বর ১

কাল জার্মানি রওনা হব। আমাকে যেতে হবে ফ্রাঙ্কফুর্ট থেকে আন্দাজ সত্তর কিলোমিটার উত্তর-পশ্চিমে কোবলেনৎস শহরে। এক্‌হার্টকে গত ক'মাসের ঘটনাবলি জানিয়ে চিঠি লিখেছিলাম। সে দ্বিগুণ উৎসাহে আমাকে আমন্ত্রণ জানিয়েছে। যাতায়াতের সব বন্দোবস্ত হয়ে গেছে। সাতদিন আমি এক্‌হার্টের অতিথি হয়েই থাকব।

ইয়ের আয়তন গত দেড়মাসে আর বাড়েনি, যদিও তার বুদ্ধি উত্তরোত্তর বেড়েই চলেছে। আজকাল মাঝে মাঝে সে বই হাতে নিয়ে নাড়াচাড়া করে। তাকে চতুষ্পদ বলতেও দ্বিধা হয়।



কারণ অধিকাংশ সময়ই সে দু'পায়ে হাঁটে।

পর্যবেক্ষণের ফলে আরও যে কয়েকটি তথ্য ইয়ে সম্বন্ধে জানা গেছে সেগুলি লিপিবদ্ধ করছি—

১) বদলে যাওয়া পরিবেশের সঙ্গে দ্রুত খাপ খাইয়ে নেবার আশ্চর্য স্বাভাবিক ক্ষমতা আছে এ জন্তুর। সে জঙ্গল থেকে এলেও, মানুষের মধ্যে বাস করে তার স্বভাব দিনে দিনে মানুষের মতো হয়ে যাচ্ছে।

২) গোখরোর ঘটনা থেকে এটাই প্রমাণ হচ্ছে যে, শত্রুকে পরাস্ত করার অদ্ভুত ক্ষমতা প্রকৃতি এই জানোয়ারকে দিয়েছে। বেজির স্বাভাবিক ক্ষমতা আছে সাপকে বেকায়দায় ফেলার। এ ব্যাপারে বেজির নখ ও দাঁত তাকে সাহায্য করে। ব্যাঙের সে ক্ষমতা নেই, তাই ব্যাঙ সহজেই সাপের শিকারে পরিণত হয়। একদিন হঠাৎ যদি সাপের বিরুদ্ধে লড়ার জন্য ব্যাঙের নখ ও দাঁত গজায় তা হলে সেটা যত আশ্চর্য ঘটনা হবে, আমার জন্তুর সহসা নখ দন্ত উদ্গমও সেইরকমই আশ্চর্য ঘটনা। আমি জানি, আবার যদি তাকে সাপের সামনে পড়তে হয়, তা হলে আবার তার নখ ও দাঁত গজাবে।

৩) এই জানোয়ারের জাতটাই হয়তো বোবা, কারণ এই ক'মাসে একটিবারের জন্য সে কোনওরকম শব্দ করেনি।

নভেম্বর ৪

ইয়ে আরেকবার চমকে দিয়েছে আমাকে।

আমি ওর জন্য একটা বাক্স তৈরি করিয়ে নিয়েছিলাম, যেটা এয়ারওয়েজের কর্তৃপক্ষদের সঙ্গে বিশেষ ব্যবস্থা করে প্লেনের লেজের দিকে ক্যাবিনের মধ্যেই রাখা হয়েছিল। ফ্রাঙ্কফুর্ট পৌঁছোনোর দশ মিনিট আগে আমি ইয়ের কাছে গিয়েছিলাম তাকে একটা গরম কোট পরিয়ে দেব বলে। গিয়ে দেখি ইয়ের চেহারা বদলে গেছে; তার সর্বাঙ্গে প্রায় তিন ইঞ্চি লম্বা লোম গজিয়ে তাকে বরফের দেশে বাসের উপযুক্ত করে দিয়েছে। অবস্থা বুঝে ব্যবস্থার আরেকটা জলজ্যান্ত প্রমাণ।

ফ্রাঙ্কফুর্টে নেমে দেখি আশি বছরের বৃদ্ধ ড. এক্‌হার্ট নিজেই এসেছেন আমাকে রিসিভ করতে। এয়ারপোর্টে আর ইয়েকে বাক্স থেকে বার করলাম না, কারণ ওরকম সৃষ্টিছাড়া জানোয়ারকে দেখতে যাত্রীদের মধ্যে হইচই পড়ে যেত। এক্‌হার্ট অবিশ্যি পুলিশের বন্দোবস্ত করেছিলেন। তা ছাড়া কোনও সাংবাদিক বা ফোটোগ্রাফারকে আমার আসার খবরটা দেননি।

এক্‌হার্টকে দেখে বলতে বাধ্য হলাম যে, তাঁর বয়স যে আশি সেটা বোঝার কোনও উপায় নেই। সত্যি বলতে কী, পঞ্চাশ-বাহান্নর বেশি মনে হয় না। এক্‌হার্ট হেসে বললেন যে, সেটা জার্মানির আবহাওয়ার গুণ।

পথে গাড়িতে ভদ্রলোককে ইয়ের লোম গজানোর খবরটা দিলাম। এক্‌হার্ট বললেন, 'তোমার জানোয়ারের বিষয় যতই শুনছি ততই আমার বিস্ময় বাড়ছে। আমি ইচ্ছা করেই অন্য কোনও প্রাণিবিদ বা বৈজ্ঞানিককে তোমার আসার খবরটা দিইনি, কারণ তাদের সঙ্গে কথা বলে বুঝেছি যে, তারা ভারতে পাশ্চাত্য বিজ্ঞানচর্চার ব্যাপারটা বিশেষ শ্রদ্ধার চোখে দেখে না। তাদের কাছে ইন্ডিয়া এখনও রোপ-ট্রিক আর স্নেক-চার্মারের দেশ।'

এক ঘণ্টার মধ্যেই আমরা কোবলেনৎস পৌঁছে গেলাম। শহরের বাইরে অত্যন্ত মনোরম পরিবেশে এক্‌হার্টের বাসস্থান। আমি জানতাম যে, এক্‌হার্টের পরিবার জার্মানির সবচেয়ে সম্ভ্রান্ত পরিবারের অন্যতম। বাড়ির ফটকে 'শ্লস এক্‌হার্ট' অর্থাৎ এক্‌হার্ট কাস্‌ল ফলক তার



সাক্ষ্য বহন করছে। কাস্‌লের চারিদিক ঘিরে নানান গাছে ভরা বিস্তীর্ণ বাগান, তাতে গোলাপের ছড়াছড়ি। বাড়িতে প্রবেশ করার আগেই এক্‌হার্ট জানিয়ে দিলেন যে, তাঁর স্ত্রী বছরচারেক হল মারা গেছেন, এখন বাড়িতে থাকেন চাকরবাকর ছাড়া এক্‌হার্ট নিজে এবং তাঁর মহিলা সেক্রেটারি। সদর দরজা দিয়ে ঢুকেই মহিলাটির সঙ্গে আলাপ হল। নাম এরিকা ওয়াইস। চেহারায় ব্যক্তিত্বের প্রকাশ পেলেও, তার সঙ্গে একটা উদাস ভাব লক্ষ করলাম।

বাড়িতে ঢুকে প্রথমেই বাক্স থেকে ইয়েকে বার করলাম। সে তৎক্ষণাৎ করমর্দনের ভঙ্গিতে এক্‌হার্টের দিকে হাত বাড়িয়ে দিল। ব্যাপারটা সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত বলেই হয়তো এক্‌হার্টের হাতটা তৎক্ষণাৎ প্রসারিত হল না। সেই অবসরে ইয়ে হাত বাড়িয়ে এগিয়ে গেল সেক্রেটারির দিকে। শ্রীমতী ওয়াইসের চোখে বিস্ময় ও পুলকের দৃষ্টি আমি ভুলব না। জানোয়ারের প্রতি

প্রকৃত মমত্ববোধ না থাকলে এ জিনিস হয় না।

একহার্ট বললেন, 'আমার কুকুরদুটোকে আপাতত বন্দি করে রেখেছি। কারণ তোমার এ জানোয়ারকে দেখে তাদের কী প্রতিক্রিয়া হবে বলা মুশকিল।'

আমি বললাম, 'আমার বিশ্বাস তোমার কুকুর যদি সভ্যভব্য হয় তা হলে কোনও দুর্ঘটনা ঘটবে না, কারণ আমার বেড়াল আমার জন্তুকে খুব সহজভাবে গ্রহণ করেছে।'

হাঁটিতে হাঁটিতে বৈঠকখানায় গিয়ে ঢুকতেই একটা দৃশ্য দেখে কেমন যেন থমকে গেলাম।

এ কি প্রাণিতত্ত্ববিদের বাড়ি, না প্রাণিহত্যাকারীর? ঘরের চারিদিকে এত জন্তুজানোয়ারের স্টাফ করা মাথা আর দেহ শোভা পাচ্ছে কেন?

একহার্ট হয়তো আমার মনের ভাবটা আন্দাজ করেই বললেন, 'আমার বাবা ছিলেন নামকরা শিকারি। এসব তাঁরই কীর্তি। এই নিয়ে বাপের সঙ্গে আমার বিস্তর কথা কাটাকাটি হয়েছে।'

ইয়ে ঘুরে ঘুরে জন্তুগুলো দেখছিল। চা আসার পর সে-ও আমাদের সঙ্গে সোফায় বসে পেয়ালা হাতে নিয়ে চুমুক দিতে লাগল। একহার্টের দৃষ্টি বারবার তার দিকে চলে যাচ্ছে সেটা আমি লক্ষ করছিলাম। ইয়ে যে ভারতীয় ভেলকি বা ধাপ্পাবাজি নয় সেটা আশা করি ও বুঝেছে। কিন্তু আশি বছর বয়সে সে এমন স্বাস্থ্য কী করে রেখেছে সেটা এখনও আমার কাছে দুর্বোধ্য। আলাপ আরেকটু জমলে পর এর রহস্যটা কী সেটা জিজ্ঞেস করতে হবে।

চা-পান শেষ হলে পর একহার্ট সোফা থেকে উঠে পড়ে বললেন, 'আজকের দিনটা তুমি বিশ্রাম করো। তোমাদের ঘর দেখিয়ে দেবে এরিকা। কাল সকালে ব্রেকফাস্টের সময় আমার একটি পশুপ্রেমিক বন্ধুর সঙ্গে তোমার আলাপ হবে। আমার বিশ্বাস তাকে তোমার পছন্দ হবে।'

আমার দুটো সুটকেস একহার্ট-ভৃত্য আগেই আমার ঘরে নিয়ে গিয়েছিল, এবার কার্পেটে মোড়া বাহারের সিঁড়ি দিয়ে এরিকার সঙ্গে আমি গেলাম দোতলায়। থাকার ব্যবস্থা উত্তম। দুটি পাশাপাশি ঘর, একটিতে আমি, একটিতে ইয়ে। জানোয়ার কী খাবে জিজ্ঞেস করাতে এরিকাকে বললাম, 'আমরা যা খাই তাই খাবে। ওকে নিয়ে কোনও চিন্তা নেই।'

এরিকা শুনে একটা নিশ্চিন্তভাব করার পরমুহূর্তেই তাঁর চাহনির উপর যেন একটা সংশয়ের পর্দা নেমে এল। তিনি যেন কিছু বলতে চান, কিন্তু ইতস্তত করছেন।

'আর কিছু বলার আছে কি?' আমি আশ্বাসের সুরে প্রশ্ন করলাম।

'মানে ভাবছিলাম...তোমার কাছে কোনও অস্ত্র আছে কি?'

'কেন, এখানে কি চোরডাকাতের উপদ্রব হয় নাকি?'

'না, তা নয়, কিন্তু...ভাবছিলাম...তোমার জন্তুর তো একটা প্রোটেকশন দরকার। এমন আশ্চর্য প্রাণী...'

'ভয় নেই, আমার পিস্তল আছে।'

'পিস্তল?'

পিস্তল শুনে এরিকা ভরসা পেলেন না। বোধ হয় বন্দুক কি স্টেনগান বললে আরও আশ্বস্ত হতেন।

আমি আমার অ্যানাইহিলিন পিস্তলের মহিমা আর এঁর কাছে প্রকাশ করলাম না। শুধু বললাম, 'ভয় নেই। পিস্তলই যথেষ্ট।'

ভদ্রমহিলা চাপাকণ্ঠে বিদায় জানিয়ে চলে গেলেন। মনে একটা সামান্য খটকার অনুপ্রবেশ রোধ করতে পারলাম না। যদিও জানি যে আমার পিস্তলের মতো ব্রহ্মাস্ত্র আর দ্বিতীয় নেই।

ইয়ে ইতিমধ্যে নিজে থেকেই তার ঘরে চলে গেছে। গিয়ে দেখি সে জানালা দিয়ে বাইরের

দৃশ্য দেখছে। আশা করি তার মনে কোনও উদ্বেগ নেই। এই অবোলা জীবের মন বোঝা সব সময় আমার পক্ষে সম্ভব হয় না। তার যদি কোনও অনিষ্ট হয় তা হলে আমার অবস্থা হবে শোচনীয়। এই ক'মাসে তার উপর গভীর মায়া পড়ে গেছে।

নভেম্বর ৬

আজ কতকগুলো গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা আমাকে রীতিমতো ভাবিয়ে তুলেছে। তার সঙ্গে কিছু চমক লাগাবার মতো ঘটনাও ঘটেছে, এবং সেটা, বলা বাহুল্য, ইয়েকে কেন্দ্র করে।

কাস্‌পার মাক্সিমিলিয়ান হেলব্রোনার—এই গালভরা নামের অধিকারী হলেন এক্‌হার্টের বন্ধু। তবে এঁকে আমি কাস্‌পার বলেই উল্লেখ করব। কারণ এক্‌হার্টও তাঁকে ওই নামেই ডাকেন। একহারা, ঢ্যাঙা চেহারা, মাংসের অভাবে চোয়াল ও চিবুকের হাড় বেরিয়ে মুখে একটা পাথুরে ভাব এনেছে, তার সঙ্গে রয়েছে একজোড়া ঘন ভুরু আর একমাথা কদমছাঁট চুল। চেহারা দেখলে সম্ভ্রমের চেয়ে শঙ্কাই হয় বেশি; ইনি যে কখন কী করে বসবেন বলা যায় না।

এক্‌হার্ট ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিয়ে বললেন, 'কাস্‌পার আমার অনেককালের বন্ধু। জন্তুজানোয়ার সম্পর্কে ইনি বিশেষ উৎসাহী ও ওয়াকিবহাল।'

ইয়ে অবশ্য আমার সঙ্গেই ছিল। কাস্‌পার তার দিকে বেশ কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে কেবল একটি মন্তব্যই করলেন—'হোয়াট এক্সকুইজিট ফার!'

ইয়ের গায়ের লোম যে অতি মসৃণ এবং সুদৃশ্য সেটা সকলেই স্বীকার করবে। বিশেষ করে গোলাপির মধ্যে এমন হলুদের আভা আর কোনও জানোয়ারের লোমে আমি দেখিনি।

কিন্তু লোমের প্রতি কাস্‌পার সাহেবের এই লোলুপ দৃষ্টি আমার মোটেই ভাল লাগল না। এই লোমের জন্য কত নিরীহ প্রাণীকে যে হত্যা করা হয়ে থাকে—বিশেষত পশ্চিমে—তার হিসেব নেই। চিঞ্চিলা নামে একটি ইঁদুরজাতীয় জানোয়ার আছে, তার লোম অভিজাত মেমসাহেবদের এত প্রিয় যে, একটি জানোয়ারের লোমের জন্য তাঁরা দশ-বিশ হাজার টাকা দিতে প্রস্তুত। মনে মনে বললাম, হে ঈশ্বর, লোমব্যবসায়ীর দৃষ্টি যেন আমার এই জন্তুটির উপর না পড়ে।

ব্রেকফাস্ট খেতে খেতে বাকি কথা হল। ইয়েকে টেবিলে বসে খেতে দেখে কাস্‌পার বললেন, 'আশ্চর্য ট্রেনিং দিয়েছ তো তোমার জানোয়ারকে! এ যে দেখছি শিম্পাঞ্জিকেও হার মানায়।'

আমি বলতে বাধ্য হলাম যে, ইয়ে যা করছে তার কোনওটাই আমি তাকে শেখাইনি। আসলে ওর পর্যবেক্ষণ ও অনুকরণের ক্ষমতা অসাধারণ।

'পরিবর্তিত পরিবেশের সঙ্গে তৎক্ষণাৎ খাপ খাইয়ে নেবার যে কথাটা তুমি বলছিলে, তার কোনও নমুনা দেখাতে পার কি?'

আমি মৃদু হেসে বললাম, 'আমি তো ওকে ডিমনস্ট্রেশন দেবার জন্য আনিনি। সেটা যদি তোমার সামনে আপনা থেকেই ঘটে তা হলেই দেখতে পাবে। আসলে সব প্রাণীকেই প্রকৃতি আত্মরক্ষার কতকগুলো উপায় সমেত সৃষ্টি করে। বাঘের গায়ের ডোরা আর বুটি তাদের জঙ্গলের গাছপালার মধ্যে প্রায় অদৃশ্য হয়ে মিশে থাকতে সাহায্য করে। তা ছাড়া এক জানোয়ার যাতে সহজে অন্য জানোয়ারের শিকার না হয়ে পড়ে তারও ব্যবস্থা থাকে। শজারুর কাঁটা অনেক জাঁদরেল জানোয়ারকেও বেকায়দায় ফেলে দেয়। অনেক জানোয়ারের গায়ের উগ্র গন্ধ তাদের শত্রুদের হাত থেকে বাঁচিয়ে রাখে। যারা অপেক্ষাকৃত নিরীহ জানোয়ার—

যেমন হরিণ বা খরগোশ—প্রকৃতি তাদের দিয়েছেন দ্রুতবেগে পলায়নের ক্ষমতা। অবিশ্যি এই নিয়মেরও ব্যতিক্রম আছে। সব জানোয়ার শত্রুর হাত থেকে সমান নিরাপদ নয়।'

'তুমি বলছ তোমার এই জন্তু আত্মরক্ষার উপায় জানে?' প্রশ্ন করলেন কাস্‌পার।

আমি বললাম, 'তার দুটো পরিচয় আমি পেয়েছি। গোখরো সাপের আক্রমণ থেকে সে যে শুধু নিজেকে বাঁচিয়েছে তা নয়, সাপকে সে যুদ্ধে পরাজিত করেছে। আর শীতের প্রকোপ থেকে সে কীভাবে নিজেকে বাঁচিয়েছে সে তো চোখের সামনেই দেখতে পাচ্ছ। আত্মরক্ষার তাগিদেই ক্রমবিবর্তনের ফলে যে পৃথিবীর প্রাণীর রূপ পালটেছে সে তো জানোই। আদিম জলচর প্রাণীই জলের যখন অভাব হল তখন প্রথমে হল উভচর। তারপর স্থলচর। সরীসৃপের ডানা গজিয়েই হল প্রথম উড়ন্ত জানোয়ার—সেও তো পরিবেশ বদলের জন্যই। এসব পরিবর্তন হতে কোটি কোটি বছর লেগেছিল। পরিবর্তিত অবস্থার সঙ্গে খাপ খাওয়ানোটা তো চোখের নিমেষে হয় না!'

'কিন্তু তোমার জানোয়ারের ক্ষেত্রে সেটাই হয়েছে?' বললেন কাস্‌পার।

'তাই তো দেখলাম চোখের সামনে।'

কথাটা কাস্‌পার বিশ্বাস করলেন বলে মনে হল না। আমি ভেবেছিলাম এক্‌হার্ট আমাকে সাপোর্ট করবেন, কিন্তু তাঁকেও ভ্রূকুঞ্চিত দেখে কিঞ্চিৎ বিস্মিত হলাম।

প্রাতরাশের পর এক্‌হার্ট প্রস্তাব করলেন তাঁর বিস্তীর্ণ বাগানটা একটু ঘুরে দেখে আসার জন্য। রাত্রে তুষারপাতের ফলে সেই বাগানে এখন বরফের গালিচা বিছানো রয়েছে, সেটা সকালে উঠে জানালা দিয়ে দেখেছি।

আমি প্রস্তাবে আপত্তি করলাম না।

বাগানটা যে কতখানি জায়গা জুড়ে তা আমার ধারণা ছিল না। অবিশ্যি সবটাকেই বাগান বললে ভুল হবে। ফুলগাছের পাট কিছুদূর গিয়েই শেষ হয়ে গেছে, তারপর সবই বড় বড় গাছ, তার মধ্যে অধিকাংশই পাইন জাতীয়। এটাকে বন বললেই ঠিক বলা হবে।

আমি এক্‌হার্টকে প্রাণিতত্ত্ব বিষয়ে একটা প্রশ্ন করতে যাচ্ছিলাম, এমন সময় জানোয়ারের কণ্ঠস্বর শুনে সেটা আর করা হল না।

হাউন্ডের ডাক। অ্যালসেশিয়ান।

'হানসেল আর গ্রেটেলও দেখছি বেড়াতে বেরিয়েছে,' বললেন এক্‌হার্ট।

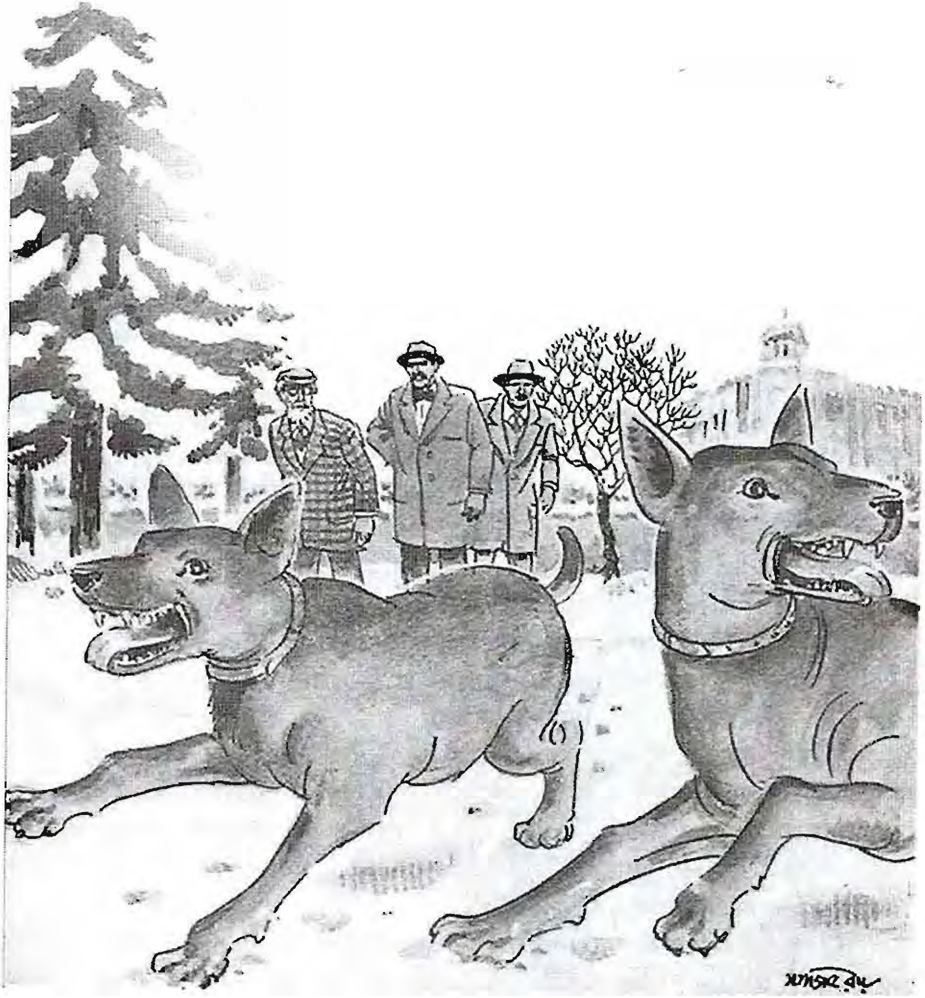
আমি প্রথমে ইয়ের হাত ধরে হাঁটছিলাম, তারপর নিজেই হাতটা ছেড়ে দিয়েছিলাম। এখন তার দিকে আড়চোখে চেয়ে দেখি তার ভুরু কুঁচকে গেছে।

এবার প্রায় একশো গজ দূরে কুকুরদুটোকে দেখতে পেলাম। দুটোর গলাতেই বকলস, চামড়ার দড়ি এক্‌হার্টের চাকরের হাতে ধরা।

কুকুর আর আমরা পরস্পরের দিকে এগিয়ে চলেছি। দূরত্ব যখন আন্দাজ ত্রিশ গজ, তখন অ্যালসেশিয়ান দুটো থেমে গেল, তাদের দৃষ্টি সটান ইয়ের দিকে। আমরা চারজনেও থেমে গেছি। আমি ইয়ের দিকে এগিয়ে গিয়ে তার হাতটা ধরে নিলাম। কাস্‌পার ও এক্‌হার্ট বুঝতেই পারছি, ঘটনা কোন দিকে যায় তাই দেখার জন্য অপেক্ষা করছেন।

দুটো কুকুরের দড়িতেই যে টান পড়ছে সেটা আমি লক্ষ করছিলাম, আর সেইসঙ্গে মৃদু হুংকারও শুনতে পাচ্ছিলাম মাঝে মাঝে।

হঠাৎ প্রচণ্ড হ্যাঁচকা টানে এক্‌হার্ট-ভৃত্যকে বরফের উপর ফেলে দিয়ে হানসেল আর গ্রেটেল ছুটে এল আমাদের দিকে, আর ঠিক সেই মুহূর্তে আমার হাতে একটা টান অনুভব করাতে দেখলাম ইয়ে বিদ্যুদ্বেগে বাঁ দিকে ছুটে গিয়ে একটা তুষারাবৃত ঝোপের পিছনে অদৃশ্য হয়ে গেল।



সে ভয় পেয়েছে। এই জোড়া প্রতিদ্বন্দ্বীকে পরাস্ত করার ক্ষমতা প্রকৃতি তাকে দেয়নি।

প্রায় যন্ত্রের মতোই আমিও ছুটে গেলাম ইয়ের পিছনে, আর আমার পিছনে এক্‌হার্ট ও কাস্‌পার।

কুকুর দুটোর হিংস্র চাহনি আগেই লক্ষ করেছিলাম; এবার দেখলাম শিকারের লোভে তাদের পাগলের মতো ছোটাছুটি। তারা হন্যে হয়ে খুঁজছে আমার জন্তুকে।

আমি প্রমাদ গুনলাম। বাধ্য হয়ে চেঁচিয়ে বলতে হল, 'দোহাই ড. এক্‌হার্ট, আপনার কুকুরদুটোকে থামান।'

'ইম্‌পসিবল,' রুদ্ধস্বরে বললেন এক্‌হার্ট, 'এ অবস্থায় ওদের থামানো ভগবানের অসাধ্য।'

কিন্তু আশ্চর্য ব্যাপার—যেদিকে ইয়ে গিয়েছিল সেইদিকেই গিয়েছে কুকুরদুটো, কিন্তু আমার সেই পোষা অনুগত জানোয়ারের কোনও চিহ্ন নেই।

প্রায় পাঁচ মিনিট উদ্দাম দাপাদাপির পর হানসেল আর গ্রেটেল হাল ছেড়ে দিয়ে জিভ বার করে হাঁপাতে লাগল, আর তাদের পরিচালক এগিয়ে গিয়ে কুকুরের গলার দড়ি হাতে তুলে

নিল।

'ওদের বাড়িতে নিয়ে যাও', হুকুম করলেন এক্‌হার্ট।

'কিন্তু তোমার জানোয়ার কোথায় উধাও হল?' প্রশ্ন করলেন কাস্‌পার।

আমিও অবিশ্যি সেই কথাই ভাবছিলাম। অথচ আশেপাশে মাটিতে গর্ত বা গাছের গায়ে ফোকরও নেই যাতে তার ভিতর লুকোনো যায়।

কুকুরদুটো প্রায় বাড়ির কাছাকাছি পৌঁছোনোর পর আত্মপ্রকাশ করলেন আমার আশ্চর্য জানোয়ার।

কিন্তু এ কী হয়েছে তার চেহারা? সে কি এতক্ষণ বরফে গড়াগড়ি করেছে?

না, তা নয়। তার গায়ের রং, তার চোখের মণি, তার মাথা থেকে পা পর্যন্ত সর্বাঙ্গ হয়ে গেছে ধবধবে সাদা। সে এখন একটা তুষারপিণ্ডের সামিল। এই অবস্থায় এই পরিবেশে তাকে খুঁজে পাওয়া অসম্ভব।

'গট ইন হিমেল!' চেঁচিয়ে উঠলেন কাস্‌পার। হ্যাঁ, ঈশ্বরের নাম উচ্চারণ এই অবস্থায় স্বাভাবিক। এমন আশ্চর্য ঘটনা দুই জার্মান নিশ্চয়ই কোনওদিন দেখেননি।

আমরা চারজন আবার এক্‌হার্ট কাস্‌লে ফিরে এলাম। সবাই মিলে সোফায় বসতে কাস্‌পারই প্রথম মুখ খুললেন।

'তোমার এই মহামূল্য সম্পত্তির ভবিষ্যৎ কী তা তুমি স্থির করেছ?'

সহজ উত্তর। বললাম, 'আমি যতদিন বেঁচে আছি ততদিন ওকে আমার কাছে রাখব। ও আমার সঙ্গী। এই ক'মাস আমিই ওকে প্রতিপালন করেছি।'

'কিন্তু বৈজ্ঞানিক হিসেবে বিশ্বের প্রাণিবিদদের প্রতি তোমার কোনও দায়িত্ব নেই? তাদের কাছ থেকে লুকিয়ে রাখতে চাও তোমার এই জন্তুকে?'

'লুকিয়ে রাখতে চাইলে আমি তাকে এখানে এনেছি কেন? ভবিষ্যতে তাকে কেউ দেখতে চাইলে আমার দেশে আমার বাড়িতে আসতে পারেন। আমার দরজা খোলাই থাকবে। জন্তু আমার কাছে নিরাপদে থাকবে। এখানে এনে কী হল তা তো দেখলেন। এরকম ঘটনা যে আরও ঘটবে না তার কী বিশ্বাস?'

'কোনও পশুশালায় রাখতে আপত্তি কী?'

'সেটা রাখলে আমার নিজের দেশের পশুশালাতেই রাখব। কলকাতার চিড়িয়াখানা নেহাত নিন্দের নয়।'

'হুঁ...'

কাস্‌পার উঠে পড়লেন।

'ঠিক আছে। আমি তা হলে আসি। আমার একটা প্রস্তাব ছিল, সেটা বোধ হয় তুমি গ্রহণ করবে না। আমি আর এক্‌হার্ট মিলে তোমাকে বিশ হাজার মার্ক দিতে রাজি আছি তোমার ওই জন্তুর জন্য। আমাদের দিলে সারা পৃথিবী ওর অস্তিত্ব জানতে পারবে। তার ফলে তোমার নামটাও অমর হয়ে থাকত। কারণ তুমিই যে ওটা দিয়েছ আমাদের, সেকথা আমরা গোপন রাখতাম না।'

'তুমি ঠিকই অনুমান করেছ। এ প্রস্তাব আমি গ্রহণ করতে পারব না।'

কাস্‌পারের সঙ্গে এক্‌হার্টও বেরিয়ে গেলেন, বোধ হয় বন্ধুকে গাড়িতে তুলে দিতে। সঙ্গে সঙ্গে ঘরে তৃতীয় ব্যক্তির আবির্ভাব হল।

শ্রীমতী এরিকা ওয়াইস! চোখেমুখে গভীর উদ্বেগের চিহ্ন।

'তুমি একা আছ,' বললেন শ্রীমতী ওয়াইস, 'তাই তোমাকে একটা কথা বলে যাই। প্রাণিবিদ এক্‌হার্টের মৃত্যু হয়েছে এক মাস আগে। তিনিই তোমাকে প্রথম চিঠিটা লিখেছিলেন। ইনি



তাঁর ছেলে। এঁরও নাম ফ্রিডরিশ। ইনি শিকারি। জন্তুজানোয়ারের প্রতি বিন্দুমাত্র মমতা নেই। তুমি কালই চলে যাও এখান থেকে। আমি তোমার টিকিটের বন্দোবস্ত করে দেব। এখানে থাকা নিরাপদ নয়।'

'কিন্তু তুমি তা হলে কার সেক্রেটারি?'

'এঁর নয়, এঁর বাবার। আমি কতকগুলো কাজ শেষ করে এক সপ্তাহের মধ্যেই চলে যাব।'

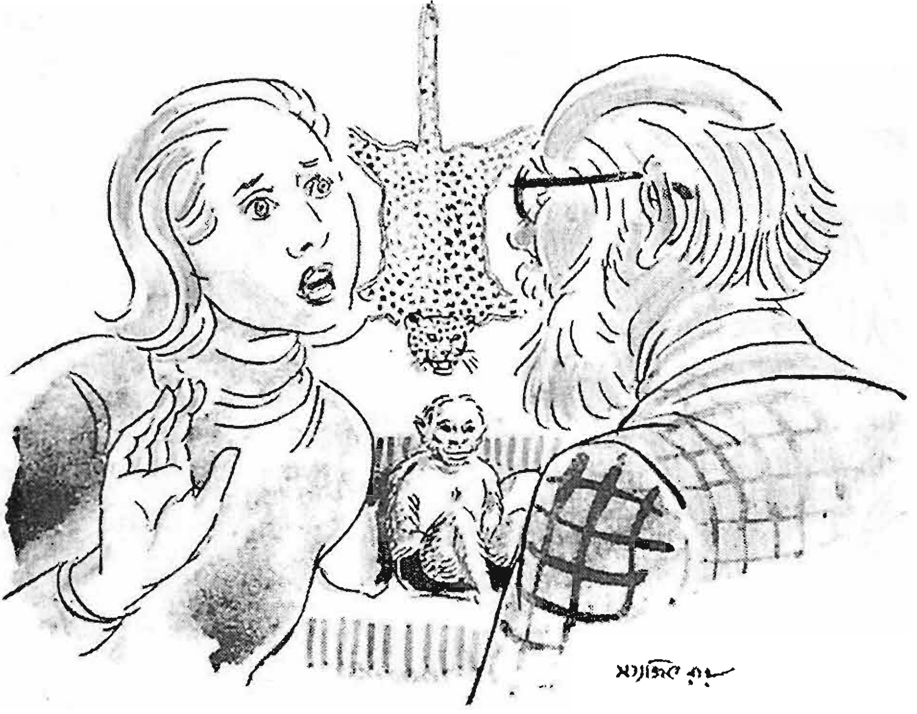
'আর কাস্‌পার ভদ্রলোকটি কে?'

'ওডিয়ন সার্কাসের মালিক। সার্কাসের সঙ্গে একটা পশুশালা আছে, তাতে নানারকম উদ্ভট জানোয়ার—'

বাইরে জুতোর শব্দ। এরিকা পাশের দরজা দিয়ে নিঃশব্দে প্রস্থান করলেন।

'তোমাকে আজ আর বিরক্ত করব না,' ঘরে এসে বললেন এক্‌হার্ট। 'আমাদের প্রস্তাবের কথাটা ঠাণ্ডা মাথায় ভেবে দেখো। কাল সকালে আবার তোমার সঙ্গে বসব।'

এক্‌হার্ট চলে গেলেন। এতক্ষণ ইয়ের দিকে দৃষ্টি দিইনি, এবার চেয়ে দেখি সে আবার পূর্ব



অবস্থায় ফিরে এসেছে।

এখন রাত এগারোটা বাজে। ইয়ের ঘরে গিয়ে দেখে এসেছি সে ঘুমোচ্ছে। আজকের অভিজ্ঞতাটা কি তার কাছে একটা বিভীষিকা, নাকি সে এজাতীয় ঘটনা উপভোগ করে? যে কোনও প্রাণীই জন্মগ্রহণ করে দুটি প্রধান উদ্দেশ্য নিয়ে—এক হল আত্মরক্ষা, আর দুই, খাদ্য আহরণ করে দেহের পুষ্টিসাধন করা। দ্বিতীয়টার ব্যাপারে ইয়ের আপাতত কোনও সমস্যা নেই—অন্তত আমার কাছে সে যতদিন আছে; আর প্রথমটি যে সে অনায়াসেই করতে সক্ষম, তার প্রমাণ তো পাওয়াই গেছে। কিন্তু প্রশ্ন হল, আজ এরিকা যে বিপদের কথা বললেন, সেটা কী ধরনের বিপদ? জানোয়ারের সঙ্গে ইয়ে যুঝতে পারে, কিন্তু মানুষের চক্রান্তের বিরুদ্ধে তার শক্তি কতটুকু তা তো জানা নেই!

এ বিষয়ে কাল ভাবা যাবে। দেখি কোথাকার জল কোথায় গিয়ে দাঁড়ায়।

নভেম্বর ৭

কাল রাতের চরম শিহরন জাগানো ঘটনা আর তার অদ্ভুত পরিসমাপ্তির কথা কোনওদিন ভুলব না।

কাল এগারোটায় শুয়ে পড়লেও ঘুম আসতে দেরি হয়েছিল। এক্‌হার্টের প্রতারণার ব্যাপারটা বারবার মনের মধ্যে মোচড় দিচ্ছিল। বোঝাই যাচ্ছে তার বাপের মৃত্যুর সুযোগ নিয়ে সে আমার জন্তুটিকে হাত করার লোভে আমাকে এখানে আনিয়েছে। সে আমাকে যাতায়াতের খরচ দেবে বলেছিল, এখনও দেয়নি। হয়তো ভেবেছিল জন্তুর জন্য বিশ হাজার মার্ক দিলে

সেটা পুষিয়ে যাবে। সে টাকা যে আমি নেব না, সেটা কি এক্‌হার্ট ভেবেছিল?

ঘুমটা এল একেবারে ম্যাজিকের মতো। বাইরে সিঁড়ির নীচে গ্র্যান্ডফাদার ক্লকে বারোটা বাজতে আরম্ভ করল সেটা শুনেছি, কিন্তু শেষ হওয়াটা আর শুনিনি। অর্থাৎ তারমধ্যেই ঘুমিয়ে পড়েছি।

ঘুমটা ভাঙল মাঝরাতে। প্রথমে মনে হল ভূমিকম্প হচ্ছে; তারপর বুঝলাম আমার শরীরটাকে নিয়ে নাড়াচাড়া করা হচ্ছে; আর তারপরেই দেখলাম আমি বন্দি, অনড়। আমাকে দড়ি দিয়ে বেঁধে ফেলা হয়েছে। আমার অ্যানাইহিলিন পিস্তল বালিশের তলায়, সেটারও নাগাল পাবার জো নেই। ঘরের দেয়ালঘড়িতে চোখ পড়াতে দেখলাম সাড়ে তিনটে। বাইরে পূর্ণিমার আলো, তাই হঠাৎ মনে হয়েছিল বুঝি ভোর হয়ে গেছে।

ঘরে অন্তত চার-পাঁচজন লোক সেটা দেখতে পাচ্ছি। একজনের হাতে টর্চ, সেটা আমার দিকে ঘোরানো রয়েছে। পাশের ঘরেও পায়ের আওয়াজ পাচ্ছি। ইয়ে কি তা হলে—?

'প্রোফেসর শঙ্কু, তোমার আশ্চর্য জন্তু না মুহূর্তের মধ্যে পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে পারে? আত্মরক্ষার অদ্ভুত সব উপায় নাকি চোখের পলকে উদ্ভব করতে পারে? এবারে বোঝা যাবে তার ক্ষমতার দৌড়।'

এক্‌হার্টের গলা। দরজার মুখটাতে দাঁড়িয়ে আছে সে।

'শাইনার, শুল্‌ট্‌স—ওকে ওই পাশের ঘরের দরজার সামনে দাঁড় করাও।'

দু'জন লোক আমাকে এক হ্যাঁচকায় বিছানা থেকে তুলে নিয়ে টেনেহিঁচড়ে ইয়ের ঘরের দরজার সামনে নিয়ে গেল।

এই ঘরেও ফিকে চাঁদের আলো, অন্ততপক্ষে ছ'সাতজন লোক, এখানেও টর্চের আলো ঘোরাফেরা করছে। তিনজন লোকের হাতে দড়ি, থলি, জাল—অর্থাৎ জানোয়ার ধরার যাবতীয় সরঞ্জাম। অন্য দু'জন লোকের হাতে ধাতব বস্তুর ঝলকানি দেখে বুঝলাম আগ্নেয়াস্ত্রেরও অভাব নেই।

কিন্তু বিছানা যে খালি সে তো দেখতেই পাচ্ছি।

দুটো লোক উপুড় হয়ে খাটের তলায় টর্চ ফেলল, আর সেই মুহূর্তে ঘটল এক তুলকালাম কাণ্ড।

একটা তীব্র ঝাঁঝালো গন্ধ দমকা হাওয়ার মতো আমার নাকে প্রবেশ করে আমার চোখ থেকে জল বার করে দিল। ল্যাবরেটরিতে নানান কেমিক্যাল নিয়ে এক্সপেরিমেন্ট করার ফলে কোনও গন্ধই আমাকে কাবু করতে পারে না; কিন্তু এই বীভৎস গন্ধের যে একটা বিশেষ ক্ষমতা আছে মানুষকে ঘায়েল করার, সেটা বুঝতে পারছিলাম।

যারা এসেছিল তারা কেউ এ গন্ধ সহ্য করতে না পেরে নাকে রুমাল দিয়ে প্রায় ছটফট করতে করতে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। এক্‌হার্টও অবশ্য এই দলে পড়েন।

এরপরেই শুনতে পেলাম এক্‌হার্টের চিৎকার। তিনি বাইরের কোনও একটা জানলা দিয়ে মুখ বার করে বাগানে জমায়েত দলকে উদ্দেশ করে বলছেন, 'তোমরা অস্ত্র নিয়ে প্রস্তুত থেকো—জন্তুটা জানালা দিয়ে পালাতে পারে!'

আমার দৃষ্টি ইয়ের ঘর থেকে একচুল নড়েনি।

এবার খাটের তলা থেকে আমার প্রিয় আশ্চর্য জন্তু বার হয়ে হল। তারপরে এক লাফে বাগানের জানালার সামনে পৌঁছে আরেক লাফে জানালার বাইরে ঝাঁপিয়ে পড়ল। সে কি ওই অস্ত্রধারীদের শিকার হতে চলেছে?

না, তা নয়। কারণ এই সংকট মুহূর্তে পালাবার একমাত্র উপায় এই জন্তু উদ্ভব করেছে তার স্বাভাবিক ক্ষমতাবলে। ক্রমবিবর্তনের অমোঘ নিয়ম লঙ্ঘন করে চোখের নিমেষে এই স্থলচর



চতুষ্পদের ডানা গজিয়েছে।

জানালা দিয়ে বেরিয়ে সে নীচের দিকে না গিয়ে বিস্তৃত ডানার সাহায্যে তিরবেগে উঠল উপর দিকে। আমি দৌড়ে গিয়ে জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে দেখলাম জ্যোৎস্নাধৌত ম্লান আকাশে তার দ্রুত সঞ্চালমান পক্ষবিশিষ্ট দেহ ক্রমে বিন্দুতে পরিণত হচ্ছে। বাগান থেকে পর পর দুটো গুলির শব্দ পাওয়া গেল, কিন্তু এই অবস্থায় বন্দুকের নিশানা ঠিক রাখা কোনও মানুষের পক্ষেই সম্ভব নয়।

নভেম্বর ১৭

শ্রীমতী এরিকার দৌলতে যুগপৎ আমার মুক্তি, ও বন্ধুসমেত এক্‌হার্টকে পুলিশের হাতে সমর্পণ—এই দুটোই সম্ভব হয়েছিল।

গিরিডি ফেরার সাতদিন পরে খবরের কাগজে পড়লাম নিকারাগুয়ার গভীর অরণ্যে এক পশুসংগ্রহকারী দল একটি আশ্চর্য নতুন জানোয়ারের সাক্ষাৎ পেয়েছে। এই জানোয়ার নাকি দূর থেকে দাঁড়িয়ে দলের লোকেদের দিকে বারবার সেল্যুটের ভঙ্গিতে ডান হাতটা তুলে কপালে ঠেকাচ্ছিল। কিন্তু তাকে যখন জাল দিয়ে ধরতে যাওয়া হয়, তখন সে চোখের নিমেষে একটা একশো ফুট উঁচু গাছের মাথায় চড়ে ডালপালার মধ্যে অদৃশ্য হয়ে যায়। পশু সংগ্রহকারী দল নাকি এই জানোয়ারের লোভে তাদের অভিযানের মেয়াদ বাড়িয়ে দিয়েছে।

জানোয়ারের বর্ণনা থেকে তাকে আমারই ইয়ে বলে চিনতে কোনও অসুবিধা হয় না। এতদিন মানুষের মধ্যে থেকে সে মানুষের স্বভাব আয়ত্ত করেছিল, এখন আবার জঙ্গলের পরিবেশের সঙ্গে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিয়েছে। কিছুদিন খোঁজার পরই যে এ অভিযাত্রী দল হাল ছাড়তে বাধ্য হবে, তাতে কোনও সন্দেহ নেই।

কিন্তু ইয়ে কি তা হলে আর ফিরে আসবে না আমার কাছে?

না এলেই ভাল। যতদিন তার আয়ু, ততদিন তার আশ্চর্য ক্ষমতা নিয়ে সে বেঁচে থাকুক। আমার বৈজ্ঞানিক মনের একটা অংশ আক্ষেপ করছে যে, তাকে ভাল করে স্টাডি করা গেল না, তার বিষয়ে অনেক কিছুই জানা গেল না। সেইসঙ্গে আরেকটা অংশ বলছে যে, মানুষের সব জেনে ফেলার লোভের একটা সীমা থাকা উচিত। এমন কিছু থাকুক, যা মানুষের মনে প্রশ্নের উদ্রেক করতে পারে, বিস্ময় জাগিয়ে তুলতে পারে।

আনন্দমেলা। পূজাবার্ষিকী ১৩৯০



প্রোফেসর রন্ডির টাইম মেশিন

নভেম্বর ৭

পৃথিবীর তিনটি বিভিন্ন অংশে তিনজন বৈজ্ঞানিক একই সময় একই যন্ত্র নিয়ে গবেষণা চালাচ্ছে, এরকম সচরাচর ঘটে না। কিন্তু সম্প্রতি এটাই ঘটেছে। এই তিনজনের মধ্যে একজন অবিশ্যি আমি, আর যন্ত্রটা হল টাইম মেশিন। কলেজে থাকতে এইচ. জি. ওয়েলসের আশ্চর্য কাহিনী 'টাইম মেশিন' পড়ার পর থেকেই আমার মনে ওইরকম একটা যন্ত্র তৈরি করার ইচ্ছা পোষণ করে আসছি। শুধু ইচ্ছা নয়, গত বছর এ নিয়ে কাজও করেছি কিছুটা। তবে সে কাজ থিওরির পর্যায়ে পড়ে। আমার ধারণা থিওরিটা বেশ মজবুত চেহারা নিয়েছিল, আর সে ধারণা যে ভুল নয়, সেটা প্রমাণ হয়েছিল গত ফেব্রুয়ারিতে যখন ম্যাড্রিডে একটা বিজ্ঞানী সম্মেলনে এই নিয়ে একটা প্রবন্ধ পড়ি। সকলেই সেটা খুব তারিফ করে। কিন্তু উপযুক্ত যন্ত্রপাতি এবং টাকার অভাবে কাজটা আর এগোয়নি। ইতিমধ্যে জার্মানির কোলোন শহরে প্রোফেসর ক্লাইবার টাইম মেশিন তৈরির ব্যাপারে বেশ কিছুদূর অগ্রসর হয়েছিলেন, সে খবর আমি পাই আমার জার্মান বন্ধু উইল্‌হেল্‌ম্‌ ক্রোলের কাছ থেকে। ক্লাইবার ম্যাড্রিডে আমার বক্তৃতায় উপস্থিত ছিলেন; সেইখানেই তাঁর সঙ্গে আলাপ হয়। দুঃখের বিষয়, এই কাজ শেষ হবার আগেই ক্লাইবারের মৃত্যু হয় অজ্ঞাত আততায়ীর হাতে। এটা হল পনেরো দিন আগের খবর। পদার্থবিজ্ঞানী ক্লাইবার ছিলেন ধনী ব্যক্তি; বিজ্ঞানের বাইরেও তাঁর নানারকম শখ ছিল। তার একটা হল দুষ্প্রাপ্য শিল্পদ্রব্য সংগ্রহ করা। খুনটা ডাকাতেই করেছে বলে অনুমান করা হয়, কারণ যে ঘরে খুন হয়—ক্লাইবারের কাজের ঘর বা স্টাডি—সে ঘর থেকে তিনটি মহামূল্য শিল্পদ্রব্য লোপ পেয়েছে। ক্লাইবারকে কোনও ভোঁতা অস্ত্র দিয়ে মাথায় বাড়ি মেরে হত্যা করা হয়েছিল। সে অস্ত্র পুলিশ বহু অনুসন্ধান করেও খুঁজে পায়নি, খুনিও আজ পর্যন্ত ধরা পড়েনি।

তৃতীয় যে বিজ্ঞানী এই একই মেশিন নিয়ে কাজ করছিলেন, তিনি হলেন ইতালির মিলান শহরের পদার্থবিজ্ঞানী প্রোফেসর লুইজি রন্ডি। রন্ডির মেশিন তৈরি হয়ে গেছে, এবং তার ডিমনস্ট্রেশনও হয়ে গেছে। রন্ডি ম্যাড্রিডে উপস্থিত ছিলেন না, এবং আমি আগে কিছুই জানতে পারিনি যে তিনিও একই গবেষণায় লিপ্ত। গত মাসে রন্ডির নিজের লেখা চিঠিতে জানি তার টাইম মেশিন তৈরি হয়ে গেছে। সে আমাদের সাদর আমন্ত্রণ জানিয়েছে মিলানে গিয়ে তার যন্ত্র দেখে আসতে। আমি যে এই প্রতিযোগিতায় হেরে যাব এটা আমি আগেই আশঙ্কা করেছিলাম; তবে এই ফাঁকে যে রন্ডি কেল্লা ফতে করবে, সেটা অনুমান করতে পারিনি। আমি ভাবছি এ মাসের মধ্যেই একবার মিলান ঘুরে আসব। রন্ডি শুধু যে আমার আতিথেয়তার ভার নিচ্ছে তা নয়; প্লেনে যাতায়াতের ভাড়াও সেই দেবে। আসলে রন্ডিও রীতিমতো ধনী। তার পরিচয় শুধু বৈজ্ঞানিক প্রোফেসর রন্ডি হিসেবে নয়, সে হল কাউন্ট লুইজি রন্ডি। অতএব অনুমান করা যায় সে বিশাল সম্পত্তির মালিক। অবিশ্যি আমি ব্যাপারটা বুঝি; এত বড় একটা আবিষ্কারের প্রকৃতি বিচার বিজ্ঞানীর দ্বারাই সম্ভব। বিশেষ করে আমি যখন ওই একই ব্যাপার নিয়ে কাজ করে এখনও সফল হতে পারিনি, তখন যন্ত্রটা আমাকে না দেখানো পর্যন্ত রন্ডির

সোয়াস্তি হতে পারে না। এর জন্য দশ বিশ হাজার টাকা খরচ করা একজন ধনী বৈজ্ঞানিকের পক্ষে কিছুই না।

যারা টাইম মেশিনের ব্যাপারটা জানে না, তাদের জন্য এই যন্ত্রের একটা বর্ণনা দেওয়া দরকার। এই যন্ত্রের সাহায্যে অতীতে ও ভবিষ্যতে সফর করা সম্ভব। মিশরের পিরামিড কী ভাবে তৈরি হয়েছিল তাই নিয়ে বৈজ্ঞানিকদের মধ্যে এখনও মতভেদ রয়েছে। টাইম মেশিনের সাহায্যে একজন মানুষ পাঁচ হাজার বছর আগের মিশরে গিয়ে নিজের চোখে পিরামিড তৈরির ব্যাপারটা দেখে আসতে পারে। পাঁচ হাজার কেন, পঁচাত্তর লক্ষ বছর আগে গিয়ে দেখে আসতে পারে ডাইনোসর কেমন জীব ছিল। যাওয়া মানে সশরীরে যাওয়া কি না, সেটা রন্ডির যন্ত্র না দেখা অবধি বলতে পারব না। হয়তো এমন হতে পারে যে, দেহটা যেখানে ছিল সেখানেই থাকবে, শুধু চোখের সামনে সিনেমার মতো ভেসে উঠবে অতীতের দৃশ্য। তাই বা মন্দ কী? আজকের মানুষ যদি চোখের সামনে আদিম গুহাবাসী মানুষকে দেখতে পায়, অথবা আলেকজান্ডার বা নেপোলিয়নের যুদ্ধ দেখতে পায়, বা আজ থেকে বিশ হাজার পরে পৃথিবীর চেহারা কেমন হবে তা দেখতে পায়, তা হলে সে তো আশাতীত লাভ!

আমি স্থির করেছি রন্ডির আমন্ত্রণ গ্রহণ করব। এই যন্ত্রের ব্যাপারে আমি ছেলেমানুষের মতো কৌতূহল অনুভব করছি। এ সুযোগ ছাড়া যায় না।

নভেম্বর ১২

আজ রন্ডির আরেকটা চিঠি। ইতিমধ্যে আর তার চিঠির জবাব দিয়ে দিয়েছি; কিন্তু সে সেটা পাবার আগেই আরেকবার লিখেছে। বোঝাই যাচ্ছে ভদ্রলোক একজন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন বৈজ্ঞানিকের তারিফ পাবার জন্য মুখিয়ে আছেন। আমি আজই তাঁকে টেলিগ্রামে জানিয়ে দিয়েছি আমার আসার তারিখ ও সময়।

এর মধ্যে আরেক গণ্ডগোল।

আজ সকালে হঠাৎ নকুড়বাবু এসে হাজির। এঁর কথা আমি আগে বলেছি। অতি অমায়িক, শান্তশিষ্ট ভদ্রলোক। যেন ভাজা মাছটি উলটে খেতে জানেন না, কিন্তু এঁরই মধ্যে মাঝে মাঝে একটা অলৌকিক শক্তি প্রকাশ পায়, যার ফলে ইনি সাময়িকভাবে অনেক কিছুই বুঝতে এবং করতে পারেন, যা সাধারণ মানুষে পারে না। তার মধ্যে একটা হল ভবিষ্যতের কোনও ঘটনা জানতে পারা—যেন ভদ্রলোক নিজেই একটি জীবন্ত টাইম মেশিন।

নকুড়বাবু যথারীতি আমায় প্রণাম করে আমার সামনের সোফায় বসে আমার কাজের ব্যাঘাত করার জন্য ক্ষমা চেয়ে আমাকে জানালেন যে, অদূর ভবিষ্যতে আমায় একটা বড় বিপদের সামনে পড়তে হবে, এবং সেই ব্যাপারে তিনি আমাকে সাবধান করতে এসেছেন। আমি বললাম, 'বিপদ মানে? কী রকম বিপদ?'

ভদ্রলোক এখনও হাত দুটো জোড় করে আছেন; সেইভাবেই বললেন, 'সঠিক তো বলতে পারব না স্যার, তবে দেখলুম যেন আপনার ঘোর সংকট উপস্থিত—প্রায় প্রাণ নিয়ে টানাটানির ব্যাপার। তাই ভাবলুম আপনাকে জানিয়ে দিই।'

'বিপদ থেকে উদ্ধার পাব কি?

'তা তো জানি না স্যার।'

'ব্যাপারটা ঘটবে কবে সেটা বলতে পারেন?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ, তা পারি', নকুড়বাবু বেশ প্রত্যয়ের সঙ্গে বললেন, 'ঘটনাটা ঘটবে একুশে নভেম্বর রাত ন'টায়। এর বেশি আর কিছু বলতে পারব না স্যার।'



আমি মিলানে পৌঁছোব আঠারোই। অনুমান করা যায় যে মিলানে থাকাকালীন ঘটবে যা ঘটার। আমি যতদূর জানি, রন্ডি সদাশয় ব্যক্তি। তার সম্বন্ধে কোনও বদনাম শুনিনি কখনও। তা হলে কি বিপদটা আসবে রন্ডির যন্ত্র থেকে?

যা হোক, যা কপালে আছে তা হবে। তবে মরার আগে যদি একবার অতীত ও ভবিষ্যতে ঘুরে আসতে পারি তা হলে মন্দ কী?

নভেম্বর ১৮, মিলান

আমি আজই সকালে এখানে পৌঁছেছি। গমগমে, আধুনিক, ব্যস্ত শহর, ইতালির ব্যবসা-বাণিজ্যের অন্যতম কেন্দ্র। শহরের একটু বাইরে অপেক্ষাকৃত নিরিবিলি অঞ্চলে রন্ডির প্রাসাদোপম প্রাচীন বাসস্থান। রন্ডি নিজেই গাড়ি চালিয়ে আমাকে এয়ারপোর্ট থেকে নিয়ে এল। বয়স বাহান্ন হলেও মাজাঘষা ঝকঝকে চেহারার জন্য সেটা বোঝার উপায় নেই। মাথার চুল এখনও পাকেনি। ফ্রেঞ্চকাট দাড়ি আর গোঁফটাও কুচকুচে কালো।

এয়ারপোর্ট থেকে আসার পথে মুখ থেকে ক্লে পাইপ নামিয়ে রন্ডি বলল, 'তোমার বক্তৃতা আমি নিজে না শুনলেও, ইতালিয়ান পত্রিকা 'ইল টেম্পো'তে ছাপা হবার পর সেটা আমি পড়ি। তুমি তোমার মেশিন তৈরি করতে পারোনি জেনে আমি দুঃখিত।'

এর পর রন্ডি যা বলল, তাতে আমি অবাক না হয়ে পারলাম না।

'তোমাকে এখানে আসতে বলার পিছনে আসল কারণটা আমি চিঠিতে জানাইনি। সেটা এখন তোমাকে বলি। আমার যন্ত্র কাজ করছে ভালই; অতীত ও ভবিষ্যৎ দু'দিকেই যাওয়া যায়, এবং ভৌগোলিক অবস্থান জানা থাকলে নির্দিষ্ট জায়গাতেও যাওয়া যায়। যেমন কালই আমি খ্রিস্টপূর্ব যুগে গ্রিসে দার্শনিকদের এক বিতর্কসভায় উপস্থিত হয়ে গ্রিক ভাষায় বাকবিতণ্ডা শুনলাম কিছুক্ষণ ধরে। সময়টা ছিল দুপুর। আমি যদি সকাল দশটা, বা অন্য কোনও নির্দিষ্ট সময়ে গিয়ে পৌঁছোতে চাইতাম, তা হলে পারতাম না, কারণ আমার যন্ত্রে সেটা আগে থেকে স্থির করার কোনও উপায় আমি ভেবে পাইনি। এ ব্যাপারে আমার সব চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে। তুমি যদি এর একটা উপায় বাতলে দিতে পার, তা হলে তোমাকে আমি আমার কোম্পানির একজন অংশীদার করে নেব।'

'কোম্পানি?' আমি একটু অবাক হয়েই জিজ্ঞেস করলাম।

'হ্যাঁ। কোম্পানি,' মৃদু হেসে বলল রন্ডি। 'টাইম ট্রাভেলস ইনকরপোরেটেড। যে পয়সা দেবে, সেই ঘুরে আসতে পারবে তার ইচ্ছামতো অতীতে বা ভবিষ্যতে। নিউ ইয়র্কের একটা কাগজে একটি মাত্র বিজ্ঞাপন দিয়েছিলাম। তিন সপ্তাহে সাড়ে তিন হাজার এনকোয়ারি এসেছে। আমি অবিশ্যি জানুয়ারির আগে কোম্পানি চালু করছি না, কিন্তু এর মধ্যেই আঁচ পেয়ে গেছি এ ব্যবসায়ে মার নেই।'

'কত মূল্য দিলে তবে এই সফর সম্ভব হবে?'

'সেটা নির্ভর করে কতক্ষণের জন্য এবং কতদূর অতীতে বা ভবিষ্যতে সফর তার উপর। অতীতের চেয়ে ভবিষ্যতের রেট বেশি। অতীতে ঐতিহাসিক যুগে দশ মিনিট ভ্রমণের রেট দশ হাজার ডলার। প্রাগৈতিহাসিক হলে রেট দ্বিগুণ হয়ে যাবে, আর দশ মিনিটের চেয়ে বেশি সময় হলে রেট প্রতি মিনিটে বাড়বে হাজার ডলার করে।'

'আর ভবিষ্যৎ?'

'ভবিষ্যতে সফরের রেটে তারতম্য নেই। তুমি নিকট ভবিষ্যতে যেতে চাও বা সুদূর ভবিষ্যতে যেতে চাও, তোমার খরচ লাগবে পঁচিশ হাজার ডলার।'

মনে মনে রন্ডির ব্যবসাবুদ্ধির তারিফ না করে পারলাম না। এক হুজুগে আমেরিকান লাখপতি-ক্রোড়পতির জোরেই ব্যবসা লাল হয়ে যাবে সেটা বেশ বুঝতে পারছিলাম।

এবার আমি একটা জরুরি প্রশ্ন করলাম।

'তোমার এই টাইম মেশিনের দর্শকের ভূমিকাটি কী? সে কি সশরীরে গিয়ে হাজির হবে অতীতে বা ভবিষ্যতে?'

রন্ডি মাথা নাড়ল।

'না, সশরীরে নয়। সে উপস্থিত থাকবে ঠিকই, কিন্তু অদৃশ্য, অশরীরী অবস্থায়। তাকে কেউ দেখতে পাবে না। কিন্তু সে নিজে সবই দেখবে। পৃথিবীর কোন অংশে যাওয়া হবে সেটা আগে থেকে ল্যাটিচিউড-লঙ্গিচিউডের বোতাম টিপে স্থির করা থাকবে। কত বছর অতীতে বা ভবিষ্যতে যাওয়া হবে তার জন্যেও আলাদা বোতামের ব্যবস্থা আছে। এই সব বোতাম টেপার পর দশ সেকেন্ড সময় লাগবে নির্দিষ্ট স্থান ও কালে পৌঁছোতে। একবার পৌঁছে গেলে পর বাকি কাজটা স্বপ্নে চলাফেরার মতো সহজ হয়ে যাবে। ধরো, তুমি কায়রোতে গিয়ে হাজির হয়েছ তোমার যন্ত্রের সাহায্যে; সেখান থেকে যদি গিজার পিরামিডের কাছে যেতে চাও তো

সেটা ইচ্ছা করলেই তৎক্ষণাৎ হয়ে যাবে। অর্থাৎ স্থান পরিবর্তনটা যাত্রীর ইচ্ছা অনুযায়ী হবে, কিন্তু কালটা থাকবে অপরিবর্তিত।'

'তার মানে একবার অতীত বা ভবিষ্যতে গিয়ে পৌঁছাতে পারলে তারপর যেখানে খুশি যাওয়া চলতে পারে?'

'হ্যাঁ; কিন্তু ওই যে বললাম, দিন বা রাতের ঠিক কোন সময়ে পৌঁছাচ্ছ সেটার উপর আমার যন্ত্রের কোনও দখল নেই। আমি কালই খ্রিস্টপূর্ব ত্রিশ হাজার বছর আগের আলতামিরায় যাব বলে বোতাম টিপেছিলাম—ইচ্ছা ছিল প্রস্তর যুগের মানুষেরা গুহার দেয়ালে কেমন করে ছবি আঁকে সেটা দেখব—কিন্তু গিয়ে পড়লাম এমন এক অমাবস্যার মাঝরাত্তিরে যখন চোখে প্রায় কিছুই দেখা যায় না। তখন স্থান পরিবর্তন করে চলে গেলাম সেই একই যুগের মোঙ্গোলিয়ায়, যেখানে তখন সকাল হয়েছে। কিন্তু তাতে তো আমার উদ্দেশ্য সফল হল না। তাই আমার অনুরোধ তুমি আমার যন্ত্রটা একবার দ্যাখো।'

আমি বললাম, 'দেখব বলেই তো এসেছি। তবে ওটা শোধরাবার ব্যাপারে কতদূর কী করতে পারব সেটা এখনও বলতে পারছি না। আর তুমি যে তোমার ব্যবসায়ে আমাকে অংশীদার করে নেবার কথা বলছ তার জন্য অশেষ ধন্যবাদ; কিন্তু সেটার কোনও প্রয়োজন নেই। আমি যা করব তাতে যদি আমার বৈজ্ঞানিক ক্ষমতার কোনও পরিচয় পাওয়া যায় তাতেই আমি কৃতার্থ বোধ করব।'

আমার কথায় রন্ডি কিঞ্চিৎ বিস্মিত ভাবে আমার দিকে চাইল, ভাবটা যেন—আমি কীরকম মানুষ যে রোজগারের এত বড় একটা সুযোগ পেয়েও ছেড়ে দিচ্ছি।

রন্ডির বাসস্থানে যখন পৌঁছোলাম তখন প্রায় দুপুর বারোটা। আমার ঘর দেখিয়ে দিল রন্ডি নিজে। চমৎকার ব্যবস্থা, আতিথেয়তার কোনও ত্রুটি হবে বলে মনে হয় না।

এত বড় বাড়িতে সে একা থাকে কি না সেটা জিজ্ঞেস করাতে রন্ডি বলল যে তার আরেকটা আধুনিক বাড়ি আছে রোম শহরে, সেখানে তার স্ত্রী এবং মেয়ে থাকে। রন্ডি প্রতি দু'মাসে একবার এক সপ্তাহের জন্য রোমে গিয়ে তাদের সঙ্গে কাটিয়ে আসে। 'তবে এই বাড়িটা বড় হওয়াতে কাজের সুবিধা এতে অনেক বেশি,' বলল রন্ডি। 'আমার যন্ত্রপাতি, ল্যাবরেটরি ইত্যাদি সব এখানেই আছে, আর আমার অ্যাসিস্ট্যান্ট এনরিকোও এখানে আমার সঙ্গেই থাকে। তা ছাড়া এখন তো প্রায়ই এখান সেখান থেকে বৈজ্ঞানিকেরা আসছেন আমার মেশিন দেখতে। এক দিন থেকে তাঁরা আবার যে যার জায়গায় ফিরে যান। আজ অবধি অন্তত ত্রিশ জন বৈজ্ঞানিক এসেছেন এবং সকলেই স্বীকার করেছেন যে, আমি অসাধ্য সাধন করেছি!'

কথা হল স্নানাহারের পর আমি যন্ত্রটা দেখব, তারপর রন্ডির অনুরোধ রক্ষা করতে পারব কি না সেটা স্থির করব। আমি যে টাইম মেশিনটা পরিকল্পনা করেছিলাম তাতে অবিশ্যি নির্দিষ্ট সময়ে অতীতে বা ভবিষ্যতে পৌঁছোনো যেত। আমার পরিকল্পনার সঙ্গে যদি রন্ডির যন্ত্রের কোনও মিল না থাকে তা হলে কতদূর সফল হব তা বলতে পারি না।

এইবার লেখা বন্ধ করে স্নানে যাওয়া যাক। একটার সময় লাঞ্চ, সেটা রন্ডি আগেই জানিয়ে দিয়েছে।

নভেম্বর ১৮, বিকেল চারটা

আমার মনের অবস্থা বর্ণনা করার সাধ্য আমার নেই।

আজ সম্রাট অশোকের রাজ্যে গিয়ে তাঁর পশু চিকিৎসালয় দেখে এলাম রন্ডির মেশিনের

সাহায্যে। দৃশ্য যে ষোলো আনা স্পষ্ট তা নয়। একটা মশারির ভেতর থেকে বাইরেটা যেমন দেখা যায়, এ অনেকটা সেইরকম; কিন্তু তাও রোমাঞ্চ হয়, উত্তেজনায় দম প্রায় বন্ধ হয়ে আসে। অশোক যে তার রাজ্যে আইন করে পশুহত্যা বন্ধ করে অসুস্থ পশুদের চিকিৎসার জন্য হাসপাতাল তৈরি করিয়েছিলেন সেটা ইতিহাসে পড়েছি, কিন্তু কোনওদিন সে হাসপাতাল চোখের সামনে দেখব, দেখব একটা বিশাল ছাউনির তলায় একসঙ্গে শতাধিক গোরু ঘোড়া ছাগল কুকুরের চিকিৎসা চলেছে, এটা কি স্বপ্নেও ভেবেছিলাম? লোকজন কথা বলছে, সেটাও যেন কানে তুলো গোঁজা অবস্থায় শুনতে পাচ্ছি। সব শব্দই চাপা। হয় এটা যন্ত্রের দোষ, না হয় এর চেয়ে স্পষ্ট দৃশ্য আর শব্দ সম্ভব নয়। সেটা মেশিন পরীক্ষা করে দেখলেই বুঝতে পারব। আজকে আমি শুধু যাত্রীর ভূমিকা গ্রহণ করেছিলাম; কাল মেশিনটা ভাল করে খুঁটিয়ে দেখব। এটা বলতে পারি যে আমার পরিকল্পিত মেশিনের সঙ্গে এটার যথেষ্ট মিল আছে, তাই ভরসা হয় যে আমি হয়তো রন্ডির অনুরোধ রক্ষা করতে পারব।

মেশিনটা বসানো হয়েছে একটা মাঝারি আকারের ঘরের প্রায় পুরোটা জুড়ে। নীচে একটা দু' ফুট উঁচু প্ল্যাটফর্ম, তার মাঝখানে রয়েছে একটা দরজাওয়ালা স্বচ্ছ প্লাস্টিকের কক্ষ বা চেম্বার। এই চেম্বারের মধ্যে ঢুকে দাঁড়াতে হয় যিনি সফরে যাবেন তাঁকে। কতদূর অতীত বা ভবিষ্যতে যাওয়া হবে সেটা রন্ডিকে আগে থেকে বলে দিতে হয়, তারপর যাত্রী চেম্বারে ঢুকলে পর রন্ডি প্রয়োজনমতো বোতাম টিপে মেশিন চালু করে দেয়। আচ্ছাদনের ভিতর থেকেও যাত্রাটা কন্ট্রোল করা যায়, কিন্তু রন্ডি দেখলাম কাজটা যাত্রীর উপর না ছেড়ে নিজেই করতে পছন্দ করে। অতীত বা ভবিষ্যৎ থেকে বর্তমানে ফিরে আসার ব্যাপারটা অবিশ্যি নির্দিষ্ট সময় পেরিয়ে গেলে আপনিই হয়ে যায়। যে সফরে যাচ্ছে, সে যদি দশ মিনিটের জন্য যায়, তা হলে তাকে পুরো দশ মিনিট কাটিয়ে ফিরতে হবে, যদি না তার আগে অন্য কোনও ব্যক্তি বোতাম টিপে তাকে ফিরিয়ে আনে।

প্লাস্টিকের চেম্বারে ঢুকে প্রয়োজনীয় বোতামগুলো টেপামাত্র যাত্রী একটা মৃদু বৈদ্যুতিক শক্ অনুভব করে। সঙ্গে সঙ্গে তার চোখের সামনে যেন একটা কালো পর্দা নেমে আসে। তার কয়েক সেকেন্ড পরেই সেই কালো পর্দা ভেদ করে নতুন দৃশ্য ফুটে বেরোয়। আমি দেখলাম একটা প্রশস্ত রাজপথে দাঁড়িয়ে আছি, সময়টা দুপুর, রাস্তার দু'পাশে সারি বাঁধা স্তম্ভের উপর মশাল জ্বালানোর ব্যবস্থা, রাস্তা দিয়ে পথচারী, গোরুর গাড়ি আর মাঝে মাঝে ঘোড়ায় টানা রথ চলেছে। পথের দু'পাশে কারুকার্য করা কাঠের দোতলা তিনতলা বাড়ি—সব কিছু মিলিয়ে একটা চমৎকার সুশৃঙ্খলার ছবি। আমার অশোকের পশু চিকিৎসালয় সম্বন্ধে কৌতূহল ছিল বেশি, তাই মনে মনে সেখানে যাবার ইচ্ছা প্রকাশ করতেই দৃশ্য বদলে গিয়ে দেখি হাসপাতালে এসে গেছি।

সময় যে কোথা গিয়ে কেটে গেল জানি না। দশ মিনিটের শেষে রন্ডি বোতাম টেপাতে আরেকটা মৃদু বৈদ্যুতিক শকের সঙ্গে সঙ্গে সব কিছু অন্ধকার হবার পরমুহূর্তে দেখি মেশিনের ঘরে ফিরে এসেছি। রন্ডি আমার অভিজ্ঞতা কেমন হল জিজ্ঞেস করাতে মুক্তকণ্ঠে তার যন্ত্রের সুখ্যাতি করে আমার সাধ্যমতো তার অনুরোধ রক্ষা করার চেষ্টা করব সেটাও বলে দিলাম।

আজ রন্ডির সহকারী এনরিকোর সঙ্গে আলাপ হল। বছর ত্রিশেক বয়স, সুপুরুষ, বুদ্ধিদীপ্ত চেহারা। তার মধ্যে একটা ম্রিয়মাণ ভাব লক্ষ করলাম যেটার কোনও কারণ খুঁজে পেলাম না। এত অল্প আলাপে মানুষ চেনা মুশকিল। তবে কথা বলে এটা বুঝলাম যে, ছেলেটি ভারতবর্ষ সম্বন্ধে অনেক কিছু জানে। বলল, ওর ঠাকুরদা নাকি একজন ভারত-বিশেষজ্ঞ বা ইন্ডোলজিস্ট ছিলেন, সংস্কৃত জানতেন। শুনে কৌতূহল হল। জিজ্ঞেস করলাম, 'তোমার পদবি কী?' এনরিকো বলল, 'পেত্রি।' 'তার মানে কি তুমি রিকার্ডো পেত্রির নাতি নাকি?' এনরিকো হেসে

মাথা নেড়ে জানিয়ে দিল যে আমি ঠিকই অনুমান করেছি। পেত্রির লেখা ভারতবর্ষের উপর বেশ কিছু বই আমি পড়েছি। স্বভাবতই এনরিকোকে বেশ কাছের লোক বলে মনে হল। সুযোগ পেলে ওর সঙ্গে আরও কথাবার্তা বলা যাবে।

কাল সকালে আমি মেশিনটা নিয়ে কাজে লাগব। রন্ডি বলেছে যদি আরও কাজের লোক দরকার হয় তো ব্যবস্থা করবে।

নভেম্বর ১৯

ভারতীয় বিজ্ঞানের প্রতিভূ হিসেবে আজ আমি আমার দেশের মুখ উজ্জ্বল করেছি। মাত্র তিনঘণ্টায় শুধু এনরিকোর সাহায্য নিয়ে আমি রন্ডির মেশিনে এমন একটি নতুন জিনিস যোগ করেছি, যার ফলে রন্ডির মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয়েছে।

নেবুক্যাডনেজারের ব্যাবিলনে আজ থেকে আড়াই হাজার বছর আগে পেট্রোলিয়াম বাতির ব্যবহারের ফলে রাত্রে শহরের চেহারা হত ঝলমলে। টাইম মেশিনে একটি বোতাম টিপে ব্যাবিলনে ঠিক রাত সাড়ে আটটায় পৌঁছে সে দৃশ্য আমি নিজের চোখে দেখে এসেছি। এ যে কী আশ্চর্য অভিজ্ঞতা সেটা লিখে বোঝানো যায় না। অতীতের বর্ণনায় ঐতিহাসিকদের আর কল্পনার সাহায্য নিতে হবে না। তারা এবার সব কিছু নিজের চোখে দেখে তারপর বই লিখবে। অবিশ্যি রন্ডির চড়া রেট কোনও ঐতিহাসিক দিতে পারবে কি না সে বিষয়ে সন্দেহ আছে। এ নিয়ে আমি ওর সঙ্গে কথা বলেছি, এবং বলে বুঝেছি যে, ঐতিহাসিকদের কথা রন্ডি ভাবছে না; সে এখন চাইছে তার যন্ত্রের সাহায্যে যতটা সম্ভব পয়সা কামিয়ে নিতে। এখানে তার মূল্যবোধের সঙ্গে আমার আকাশ পাতাল তফাত। এই খোশমেজাজে ব্যক্তিটির এমন অর্থলিপ্সা হয় কী করে সেটাই ভাবি।

তবে এটা স্বীকার করতেই হয় যে সে একজন প্রতিভাধর বৈজ্ঞানিক ও আবিষ্কারক। এই টাইম মেশিনের জন্য সে যে বিজ্ঞানের জগতে অমর হয়ে থাকবে তাতে কোনও সন্দেহ নেই।

আজ রন্ডি আমাকে এখানে আরও কয়েক দিন কাটিয়ে টাইম ট্র্যাভেলের আরও কিছু অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে দেশে ফিরতে বলল। আমার তাতে আপত্তি নেই। টাইম ট্র্যাভেল জিনিসটা একটা নেশার মতো; আর দেখবার জিনিসেরও তো অন্ত নেই। কাল একবার ভবিষ্যতে পাড়ি দেবার ইচ্ছা আছে। বিজ্ঞানভিত্তিক গল্প যাঁরা লেখেন তাঁরা ভবিষ্যৎকে নানানভাবে কল্পনা করেছেন। তাঁদের কল্পনার সঙ্গে আসল ব্যাপারটা মেলে কি না সেটা জানতে ইচ্ছা করে। মানুষ কি সত্যিই শেষ পর্যন্ত যন্ত্রের দাস হয়ে দাঁড়াবে? আমার নিজের তো তাই বিশ্বাস।

নভেম্বর ১৯, রাত ১১টা

জার্মানির ম্যুনিখ শহর থেকে আজ সন্ধ্যায় আমার বন্ধু উইল্‌হেল্‌ম্‌ ক্রোল ফোন করেছিল। তাকে চিঠিতে জানিয়েছিলাম যে আমি মিলানে রন্ডির বাড়িতে আসছি। ক্রোল ঠাট্টা করে বলল, 'টাইম মেশিনের সঙ্গে জড়িত একজন বৈজ্ঞানিক তো খুন হয়ে গেল; দেখো, তোমাদের যেন আবার কিছু না হয়।'

ক্রোলই বলল যে, ক্লাইবারের খুনের রহস্যের সমাধান এখনও হয়নি। মেশিন তৈরির ব্যাপারে সে আমার চেয়ে অনেক বেশি এগিয়ে গিয়েছিল; আর একমাস বেঁচে থাকলেই তার মেশিন তৈরি হয়ে যেত।

আজ ডিনারের পর থেকেই শরীরটা কেন জানি একটু বেসামাল লাগছে। মাথাটা ভার, মাঝে মাঝে যেন ঘুরে উঠছে, দেহমনে একটা অবসন্ন ভাব। আমার সর্বরোগ-নিরাময়ক ওষুধ মিরাকিউরলের বড়ি সব সময় আমার সঙ্গে থাকে, কিন্তু সেটা কোনওদিন আমাকে খেতে হয়নি। আজ একটা খেয়ে নেব। দেশের বাইরে অসুস্থ হয়ে পড়া কোনও কাজের কথা নয়।

নভেম্বর ২০, দুপুর ১টা

আজ অদ্ভুত ঘটনা। নকুড়বাবুর কথা কি শেষ পর্যন্ত ফলে যাবে নাকি? প্রথমেই বলি যে আমার ওষুধে কাজ দিয়েছে। আজ ভাল আছি। সেটা ঘুম থেকে উঠেই বুঝতে পারছিলাম। অবসন্ন ভাবটা সম্পূর্ণ চলে গেছে। কিন্তু তাও সাবধানে থাকার জন্য ব্রেকফাস্টে শুধু কফি আর একটা টোস্ট ছাড়া আর কিছু খেলাম না। রন্ডি কারণ জিজ্ঞেস করাতে গতকাল শরীর খারাপের কথাটা তাকে বললাম, এবং আমার জীবনে প্রথম আমার নিজের তৈরি ওষুধ খেতে হয়েছে সেটাও বললাম। রন্ডি কথাটা মন দিয়ে শুনল। এনরিকোর দিকে চোখ পড়াতে দেখলাম তার কপালে ভাঁজ, দৃষ্টি অন্যমনস্ক।

রন্ডি প্রশ্ন করল, 'আজ কোন সেঞ্চুরিতে যেতে চাও?'

আমি বললাম, 'আজ থেকে এক হাজার বছর ভবিষ্যতে।'

'কোন দেশে যাবে?'

'জাপান। আমার ধারণা ভবিষ্যতে জাপান টেকনলজিতে আর সব দেশকে ছাড়িয়ে যাবে। সুতরাং বিজ্ঞানের প্রগতির চেহারাটা তাদের দেশেই সবচেয়ে পরিষ্কার ভাবে ধরা পড়বে।'

রন্ডি বলল সকালে তাকে একটু বেরোতে হবে; সে এগারোটা নাগাদ ফিরে তারপর মেশিনের ঘর খুলবে।

এখানে একটা কথা বলা দরকার; যে ঘরে টাইম মেশিনটা থাকে, সে ঘরটা সব সময় চাবি দিয়ে বন্ধ করা থাকে এবং সে চাবি থাকে রন্ডির কাছে। অর্থাৎ সে নিজে দরজা না খুলে দিলে মেশিনের নাগাল পাওয়ার কোনও উপায় নেই। কাল যতক্ষণ ধরে মেশিনে কাজ করেছি ততক্ষণ রন্ডি আমার পাশে ছিল। যতবারই আমি মেশিনে চড়ে সফর করেছি, ততবারই রন্ডি আমার পাশে দাঁড়িয়ে থেকে বোতাম ঘুরিয়ে দিয়েছে। অর্থাৎ রন্ডি যে মেশিনটাকে বিশেষভাবে আগলে রাখছে, তাতে কোনও সন্দেহ নেই। অথচ চোর-ডাকাতের উপদ্রব থেকে রক্ষা পাবার জন্য বাড়িতে বার্গলার অ্যালার্মের বন্দোবস্ত আছে। সদর দরজা সব সময় বন্ধ থাকে। জানলা খোলা থাকলেও, প্রাসাদের ফটকে সশস্ত্র প্রহরী থাকে। রন্ডি কি তা হলে মেশিনটা আমার কাছ থেকে আগলে রাখছে, না এনরিকোর উপর তার সন্দেহ?

রন্ডি বেরিয়ে যাবার পর আমি তার লাইব্রেরি থেকে কয়েকটা বিজ্ঞান সংক্রান্ত পত্রিকা নিয়ে আমার ঘরে চলে এলাম। আধ ঘণ্টা পর দরজায় একটা টোকা পড়াতে খুলে দেখি ফ্যাকাশে মুখে এনরিকো দাঁড়িয়ে।

তাকে ঘরে ঢুকিয়ে দরজা বন্ধ করে প্রশ্ন করলাম, 'কী ব্যাপার বলো তো?'

'বিপদ', ধরা গলায় বলল এনরিকো।

'কার বিপদ?'

'তোমার। এবং আমি তোমায় সাবধান করেছি জানলে আমারও।'

'কী বিপদের কথা বলছ তুমি?'

'আমার বিশ্বাস কাল রাত্রে তোমার ফলের রসে বিষ মেশানো হয়েছিল।'

আমি তো অবাক। বললাম, 'এ কথা কেন বলছ?'

'কারণ আর সব কিছুই আমরা সকলেই খেয়েছি, ফলের রসটা ছিল শুধু তোমার জন্য। একমাত্র তোমারই শরীর খারাপ হয়েছিল।'

'কিন্তু আমাকে বিষ খাইয়ে মারার প্রশ্ন উঠছে কেন?'

'আমার মনে হয় টাইম মেশিনের ব্যাপারে ও কোনওরকম প্রতিদ্বন্দ্বিতা সহ্য করবে না, কারণ ওর ভয় ব্যবসাতে ওর ক্ষতি হতে পারে। ও চায় একাধিপত্য। একটা ঘটনার কথা বললেই ব্যাপারটা তোমার কাছে পরিষ্কার হবে। যেদিন মেশিনটা তৈরি হয় সেদিন প্রোফেসর আনন্দের আতিশয্যে একটু বেশি মদ খেয়ে ফেলেছিলেন। তারপর ওঁর মাতলামি আমি ওঁর অজান্তে দেখে ফেলেছিলাম। উনি ওঁর দুই প্রতিদ্বন্দ্বী ক্লাইবার ও তোমার উদ্দেশে যে কী কুৎসিত ভাষায় গালমন্দ করছিলেন, তা বলতে পারি না। ক্লাইবার অবিশ্যি তার আগেই খুন হয়েছে, কিন্তু তোমাকে উনি একচোট দেখে নেবেন সে কথা বারবার বলছিলেন নেশার ঝোঁকে। ওঁর দৃঢ় বিশ্বাস তুমি ওঁর ব্যাপারে ব্যাগড়া দেবে। উনি যে কীরকম লোক তুমি ধারণা করতে পারো না। ওঁকে মাতাল অবস্থায় না দেখলে ওঁর আসল রূপ জানা যায় না। উনি মেশিনটাকে কেমন ভাবে আগলে রেখেছেন সেটা তো তুমি দেখেছ। তোমাকে ব্যবহার করতে দিচ্ছেন, কারণ তোমাকে শেষ করে ফেলার মতলব করেছেন তাই। আর যে সব বৈজ্ঞানিক এখানে এসেছেন তাঁদের কাউকে একবারের বেশি মেশিনটা ব্যবহার করতে দেননি উনি। আমি ওঁর সহকর্মী, তিন বছর ওঁর পাশে থেকে কাজ করেছি, কিন্তু মেশিন তৈরি হয়ে যাবার পর উনি ওটা আমাকে ছুঁতে দেননি।

আমি তো অবাক। বললাম, ' তুমি টাইম মেশিনে সফর করে দেখনি এখনও?'

'সেটা করেছি,' বলল এনরিকো, 'কিন্তু প্রোফেসরের অজান্তে। উনি গতমাসে একবার রোমে গিয়েছিলেন। সেই সময় লোহার তার দিয়ে চোরের মতো করে মেশিনের ঘরের তালা খুলি আমি। সেই ভাবেই এখনও রোজই রাত্রে গিয়ে আমি টাইম মেশিনের মজা উপভোগ করি। আমার নেশা ধরে গেছে; কিন্তু প্রোফেসর জানতে পারলে আমার কী দশা হবে জানি না।'

'তুমি কি তা হলে বলছ আমি এখান থেকে চলে যাই?'

'যদি থাক, তা হলে অন্তত এমন কোনও জিনিস খেয়ো না যেটা আমরা খাচ্ছি না। বিষ প্রয়োগ করে খুন করাটা ওঁর পক্ষে মোটেই অসম্ভব নয়।'

আমার আবার নকুড়বাবুর সতর্কবাণী মনে পড়ল। আমি বললাম, 'আমার ওষুধের জন্য বিষ আমার কোনও ক্ষতি করতে পারবে না।'

'কিন্তু সেটা উনি বুঝতে পারলে তো অন্য রাস্তা নেবেন।'

'অন্য রাস্তা ওকে নিতে দেব না। আমি বুঝিয়ে দেব যে আমার ওষুধ যথেষ্ট কাজ দিচ্ছে না। সেটুকু অভিনয় করার ক্ষমতা আমার আছে। যাই হোক, আমাকে সাবধান করে দেবার জন্য অশেষ ধন্যবাদ।'

এনরিকো চলে গেল। আমি খাটে বসে মাথায় হাত দিয়ে আকাশ পাতাল ভাবতে লাগলাম। তারপর একটা কথা মনে হওয়াতে ম্যুনিখে আমার বন্ধু ক্রোলকে আরেকটা টেলিফোন করলাম। এক মিনিটের মধ্যেই তার সঙ্গে যোগাযোগ হয়ে গেল।

'কী ব্যাপার শঙ্কু? কোনও বিপদ হয়েছে নাকি?'

আমি ক্রোলকে সংক্ষেপে ঘটনাটা বললাম। ক্রোল সব শুনেটুনে বলল, 'এনরিকো ছেলেটি একটু বেশি কল্পনাপ্রবণ নয় তো?'

আমি বললাম, 'না। আমার ধারণা এনরিকো যা বলছে তাতে কোনও ভুল নেই। কিন্তু সে ব্যাপারটা আমি সামলাতে পারব মনে হয়। তোমাকে ফোন করছি এ ব্যাপারে সাহায্যের জন্য

নয়। তোমার কাছে একটা ইনফরমেশন চাই।'

'কী?'

'প্রথমে বলো—ক্লাইবারের খুনি কি ধরা পড়েছে?'

'কেন জিজ্ঞেস করছ?'

'কারণ আছে।'

'ধরা পড়েনি, তবে খুনের অস্ত্রটা পাওয়া গেছে বাড়ির বাগানের একটা অংশে মাটির নীচে। তাতে অবিশ্যি আঙুলের ছাপ নেই। কাজেই রহস্য এখনও রহস্যই রয়ে গেছে।'

'খুনটা হয় কোন তারিখে?'

'তেইশে অক্টোবর। সময়টাও জানার দরকার আছে নাকি?'

'বললে ভাল হয়।'

'কী মতলব করছ বলো তো?'

'বলতে পারো এটা আমার অদম্য অনুসন্ধিৎসা।'

'তা হলে জেনে রাখো, ক্লাইবারের কাছে একটি সাংবাদিক আসে অ্যাপয়েন্টমেন্ট করে ঠিক সন্ধ্যা সাড়ে সাতটার সময়। সে চলে যায় আটটার মধ্যে। তার কিছু পরেই ক্লাইবারের মৃতদেহ আবিষ্কার করে তার চাকর। পুলিশের ডাক্তার অনুযায়ীও খুনটা হয়েছিল সাতটা থেকে আটটার মধ্যে।'

'অনেক ধন্যবাদ।'

'তুমি সাবধানে থেকো, এবং অযথা গোলমালের মধ্যে নিজেকে জড়িয়ে ফেলো না। পারলে একবার ম্যুনিখে ঘুরে যেয়ো।'

'যদি বেঁচে থাকি!'

ফোন রাখার পর বেশ কিছুক্ষণ ধরে বসে চিন্তা করলাম।

এখন বেজেছে পৌনে দশটা। রন্ডি এগারোটায় আসবে বলেছে। আমার মাথায় একটা ফন্দি এসেছে, এই ফাঁকে সেটা সেরে নিতে পারলে ভাল। কিন্তু এটা আমার একার কাজ নয়; এনরিকোর সাহায্য চাই। এনরিকো থাকে একতলায়। তার ঘর আমার চেনা।

আমি সোজা নীচে চলে গেলাম। এনরিকো তার ঘরেই ছিল। বললাম, 'তোমাকে একবার মেশিনের ঘরটা খুলতে হবে। একটু সফরে যাওয়ার দরকার পড়েছে। এক্ষুনি।'

যেমন কথা, তেমনি কাজ। এনরিকোর তারের ম্যাজিক সত্যিই বিস্ময়কর। প্রায় চাবির মতোই সহজে খুলে গেল দরজা। এনরিকোকে আমার সঙ্গে রাখা দরকার, কারণ মেশিন চালু অবস্থায় বিপদ দেখলে সেই আবার আমাকে বর্তমানে ফিরিয়ে আনবে।

'তুমি কি অতীতে যাবে, না ভবিষ্যতে?' জিজ্ঞেস করল এনরিকো।

আমি বললাম, 'অতীতে। তেইশে অক্টোবর সন্ধ্যা সাতটা পঁচিশে। ভৌগোলিক অবস্থান ম্যাপ দেখে বলছি।'

দেয়ালে টাঙানো পৃথিবীর এক বিশাল মানচিত্র দেখে কোলোনের ল্যাটিচিউড-লঙ্গিচিউড বলে দিলাম এনরিকোকে। তারপর প্লাস্টিকের ঘরে গিয়ে ঢুকতে এনরিকো বোতাম টিপে দিল।

কোলোনের একটা ব্যস্ত চৌমাথায় পৌঁছে ইচ্ছামতো গিয়ে হাজির হলাম ক্লাইবারের বাড়ির সদর দরজার সামনে। এইখানেই অপেক্ষা করা ভাল। পাঁচ মিনিটের মধ্যেই সেই সাংবাদিকের এসে যাওয়া উচিত। আকাশে এখনও ফিকে আলো রয়েছে। ক্লাইবারের বাড়ির সামনে একটি মাঝারি আকারের বাগান; বাড়িটি দোতলা এবং ছিমছাম। বাড়ির ভিতর থেকে একবার একটা মহিলাকণ্ঠ পেলাম—কারুর নাম ধরে একটা ডাক। ক্লাইবারের বয়স চল্লিশের কিছু উপরে;



তার স্ত্রী এবং দুটি সন্তান রেখে সে গত হয়েছে এ খবর কাগজে পড়েছিলাম।

ঠিক পাঁচ মিনিট পরে একটা গাড়ির আওয়াজ পেলাম। একটা মার্সেডিজ ট্যাক্সি এসে সদর দরজার সামনে থামল। তার থেকে বেরোলেন একটি মাঝারি হাইটের ভদ্রলোক, তাঁর এক গাল দাড়ি, পরনে গাঢ় নীল সুটের উপর ওভারকোট, মাথায় ফেল্ট হ্যাট, ডান হাতে ব্রিফকেস।

ট্যাক্সির ভাড়া চুকিয়ে দিয়ে ভদ্রলোক সদর দরজার দিকে এগিয়ে কলিং বেল টিপলেন। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে দরজা খুলে দিল একটি চাকর।

'প্রোফেসর বাড়িতে আছেন কি?' আগন্তুক জিজ্ঞেস করলেন। তারপর পকেট থেকে একটা

কার্ড বার করে এগিয়ে দিয়ে বললেন, 'আমি টেলিফোনে অ্যাপয়েন্টমেন্ট করেছিলাম।'

আগন্তুক গলার স্বর খানিকটা বিকৃত করার চেষ্টা করলেও আমার চেনা চেনা লাগছিল।

চাকরটি কার্ড নিয়ে ভিতরে গিয়ে প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ফিরে এসে আগন্তুককে ভিতরে ডাকল। তার পিছন পিছন আমিও ঢুকলাম।

দরজা দিয়ে ঢুকেই ল্যান্ডিং, তার একপাশে দোতলায় যাবার সিঁড়ি, সিঁড়ির ধারে একটা হ্যাটস্ট্যান্ড। আগন্তুক ওভারকোট খুলে চাকরকে দিয়ে হ্যাটটা স্ট্যান্ডে রেখে আয়নায় একবার নিজের চেহারাটা দেখে নিলেন। তারপর চাকরের নির্দেশ অনুযায়ী পিছন দিকে একটা দরজা দিয়ে একটা ঘরে প্রবেশ করলেন, সেই সঙ্গে আমিও। নিজে অদৃশ্য হয়ে সব কিছু দেখতে পাচ্ছি বলে একটা অদ্ভুত উত্তেজনা অনুভব করছি।

ঘরটা ক্লাইবারের স্টাডি বা কাজের ঘর। একটা বড় টেবিলের পিছনে ক্লাইবার একটা চামড়ায় মোড়া চেয়ারে বসে ছিল, আগন্তুক ঢুকতেই উঠে দাঁড়িয়ে এগিয়ে এসে করমর্দন করল। লম্বা, সৌম্য চেহারা, মাথায় সোনালি চুল, ঠোঁটের উপর সরু সোনালি গোঁফ, চোখে সোনার চশমা। ক্লাইবার আগন্তুককে টেবিলের উলটোদিকে একটা চেয়ার দেখিয়ে দিল। আমি দাঁড়িয়ে রইলাম বন্ধ দরজার সামনে। আমার চোখের সামনে যেন একটা ফিনফিনে পর্দা, তার মধ্যে দিয়ে দেখছি আগন্তুক পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট বার করে ক্লাইবারকে অফার করলেন, ক্লাইবার প্রত্যাখ্যান করলে পর আগন্তুক নিজেই একটা সিগারেট ঠোঁটে পুরে ক্লাইবারের সামনে থেকে রুপোর লাইটারটা তুলে সেটা দিয়ে সিগারেটটা ধরিয়ে প্যাকেটটা আবার পকেটে রেখে দিলেন। তারপর জার্মান ভাষায় প্রশ্নোত্তর, সব প্রশ্নই ক্লাইবারের টাইম মেশিন সংক্রান্ত। আমার নিজের শীতগ্রীষ্ম বোধ নেই, কিন্তু এদের হাত কচলানো দেখে বুঝতে পারছি দু'জনেরই বেশ ঠাণ্ডা লাগছে। ঘরে একপাশে ফায়ারপ্লেসে আগুন জ্বলছে, সে আগুন একটু উসকে দেবার জন্য ক্লাইবার উঠে ফায়ারপ্লেসের দিকে এগিয়ে গেল, তার পিঠ তখন আগন্তুকের দিকে। এই সুযোগে আগন্তুক কোটের আস্তিনের ভিতর থেকে ভোঁতা লোহার রড বার করে ক্লাইবারের হেঁট হওয়া মাথায় সজোরে আঘাত করলেন, এবং ক্লাইবারের নিস্পন্দ দেহ হুমড়ি খেয়ে পড়ল মেঝেতে। তারপর আগন্তুক চোখের নিমেষে ম্যানট্‌লপিসের উপর থেকে তিনটি ছোট সাইজের মূর্তি তুলে নিয়ে ব্রিফকেসে ভরলেন।

ঠিক এই সময় ঘরের বাইরে পায়ের শব্দ, আগন্তুকের সচকিত দৃষ্টি বন্ধ দরজার দিকে, মুখ ফ্যাকাশে। কিন্তু পায়ের শব্দ মিলিয়ে গেল। এবার সুযোগ বুঝে আগন্তুক ঘর থেকে বেরোলেন, খুনের অস্ত্র আবার তাঁর আস্তিনের ভিতর লুকোনো।

আমিও বেরোলাম খুনির পিছন পিছন।

বাইরে ল্যান্ডিং-এ ওভারকোট হাতে চাকরের আবির্ভাব হল, আগন্তুক সেটা পরে নিয়ে সদর দরজার দিকে এগিয়ে গেলেন।

বাইরে এখন সম্পূর্ণ অন্ধকার; তারই মধ্যে খুনি সন্তর্পণে এগিয়ে গিয়ে বাগানের এক কোণে লোহার ডাণ্ডাটা মাটিতে পুঁতে গেট দিয়ে বাইরে বেরিয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে বুঝলাম আমার সফর শেষ।

'প্রোফেসরের গাড়ির শব্দ পেয়েছি,' চাপা গলায় বলল এনরিকো।

দুজনে মেশিনের ঘর থেকে দ্রুত বেরিয়ে এলাম। লোহার তার দিয়ে অত্যন্ত কৌশলের সঙ্গে এনরিকো দরজাটা বন্ধ করে দিল। বাইরে গাড়ির দরজা খোলা এবং বন্ধ করার শব্দ। আমি এক মিনিটের মধ্যেই আবার আমার ঘরে ফিরে এলাম।

আমি জানি ক্লাইবারের হত্যাকারী আর কেউ নয়—স্বয়ং রন্ডি। কিন্তু জেনে লাভ কী? সেই যে খুনি তার প্রমাণ আমি দেব কী করে? বিশেষ করে ঘটনার এতদিন পরে।



অনেক ভেবেও আমি এর কোনও কিনারা করতে পারলাম না।

যাই নীচে। রন্ডির চাকর কার্লো এসে খবর দিয়ে গেল যে তার মনিব মেশিনের ঘরে আমার জন্য অপেক্ষা করছে।

নভেম্বর ২২

আজ দেশে ফিরছি। আদৌ যে ফিরতে পারছি সেটা যে কত বড় সৌভাগ্যের কথা, সেটা সম্পূর্ণ ঘটনা বললে পরিষ্কার হবে। গত দু'দিন উত্তেজনা, দুশ্চিন্তা ও অসুস্থতার জন্য ডায়রি লেখার কোনও প্রশ্নই ওঠেনি।

সেদিন রন্ডি ডেকে পাঠালে পর অত্যন্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও আমি নীচে গেলাম। রন্ডির দৃষ্টি প্রখর, তাই সে বুঝে ফেলল যে, আমার অসোয়াস্তি হচ্ছে। কারণ জিজ্ঞেস করাতে মিথ্যে

কথার আশ্রয় নিতে হল। বললাম, 'আমার ওষুধে পুরো কাজ দেয়নি, তাই শরীরটা দুর্বল লাগছে।' আমার দেখার ভুল হতে পারে, কিন্তু মনে হল যেন রন্ডির চোখ চকচক করে উঠল। তারপর সে বলল, 'আমার একটা ইটালিয়ান ওষুধ খেয়ে দেখবে?'

যাতে রন্ডি কিছু সন্দেহ না করে তাই বললাম, 'তা দেখতে পারি।' আমি তো জানি যে ওষুধ যদি বড়ি হয় তা হলে সেটা জল দিয়ে খেতে হবে, আর জলে রন্ডি নির্ঘাত বিষ মিশিয়ে দেবে। কিন্তু যদ্দিন মিরাকিউরাল খাচ্ছি তদ্দিন বিষ আমার কোনও ক্ষতি করতে পারবে না। এও জানি যে, এনরিকো থাকার দরুন রন্ডি আমাকে সরাসরি খুন করতে পারবে না, অল্প অল্প করে বিষ খাইয়েই মারবে। সে তা-ই করুক, এবং সেই সঙ্গে তার ফন্দি কাজ দিচ্ছে এটা বোঝানোর জন্য আমাকেও অসুস্থতার ভান করে যেতে হবে।

অসুস্থতার অজুহাতে আজ টাইম মেশিনের ব্যাপারটা স্থগিত রাখা হল। রন্ডি ওষুধ এনে দিল। বড়িই বটে। রন্ডিরই আনা জল দিয়ে সে-বড়ি খেয়ে আধ ঘণ্টার মধ্যেই আমি মিরাকিউরল খেয়ে নিলাম।

কিন্তু এ ভাবে আর কতদিন চলবে? এদিকে জলজ্যান্ত প্রমাণ যখন পেয়েছি যে রন্ডিই ক্লাইবারের আততায়ী, তখন তার একটা শাস্তির ব্যবস্থা না করে দেশেই বা ফিরি কী করে?

কিন্তু অনেক ভেবেও কোনও রাস্তা খুঁজে পেলাম না।

লাঞ্চের সময় রন্ডি জিজ্ঞেস করল কেমন আছি। আমি বললাম, 'খানিকটা জোর পাচ্ছি বলে মনে হচ্ছে, কিন্তু আমি অল্প করে খাব।'

এনরিকোর সঙ্গে দৃষ্টি বিনিময় হল। সে আমার পাশেই বসেছিল। অত্যন্ত কৌশলের সঙ্গে সে খাবার এক ফাঁকে আমার ডান হাতে একটা ভাঁজ করা ছোট্ট কাগজ গুঁজে দিল। খেয়েদেয়ে ঘরে এসে কাগজ খুলে দেখি তাতে লেখা, 'আজ দুপুরে তোমার সঙ্গে দেখা করব।'

আড়াইটে নাগাদ তার কথামতো এনরিকো এসে হাজির। সে বলল, 'তখন হঠাৎ প্রোফেসর এসে পড়ায় তোমার কাছে জানতে পারিনি তোমার কোলোন সফরের ফলাফল।'

আমি বললাম, 'তুমি যে এলে, যদি তোমার প্রোফেসর টের পান?'

এনরিকো বলল, 'প্রোফেসরের অনেকদিনের অভ্যাস দুপুরে লাঞ্চের পর এক ঘণ্টা ঘুমোনো। ইটালির 'সিয়েস্তা'র ব্যাপারটা জান তো, এখানকার লোকেরা দুপুরে একটু না ঘুমিয়ে পারে না।'

আমি এনরিকোকে আমার সফরের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ দিয়ে বললাম, 'প্রোফেসর রন্ডিই যে ক্লাইবারের আততায়ী, সে বিষয়ে আমার কোনও সন্দেহ নেই। তিনি ছদ্মবেশ নিলেও তাঁর গলার স্বরে আমি তাঁকে চিনে ফেলেছি। কিন্তু কথা হচ্ছে, তাঁকে কী ভাবে দোষী সাব্যস্ত করা যায়। প্রমাণ কোথায়?'

এনরিকো বলল, 'প্রোফেসর গত মাসে রোমে যাচ্ছেন বলে যাননি, সে খবর আমি আমার এক রোমের বন্ধুর কাছে পেয়েছি। সুতরাং অনুমান করা যায় যে তিনি কোলোন গিয়েছিলেন। কিন্তু আমার মনে হয় না যে এটাকে চূড়ান্ত প্রমাণ বলে ধরা যায়।'

আমি মাথা নাড়লাম। রোম না গেলেই যে কোলোন যেতে হবে, এমন কোনও প্রমাণ নেই।

এবার এনরিকোকে একটা কথা না বলে পারলাম না।

'আমার এক অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন বন্ধু আমায় বলেছেন যে একুশে রাত ন'টায় আমার একটা বিপদ আসবে। সে বিপদ থেকে রক্ষা পাব কি না সেটা সে বলতে পারেনি। আমার জানতে ইচ্ছা করছে বিপদটা কী ভাবে আসবে।'

'এ ব্যাপারে তুমি টাইম মেশিনের সাহায্য নিতে চাইছ কি?'

'হ্যাঁ।'



এনরিকো ঘড়ি দেখে বলল, 'তা হলে এক্ষুনি চলো। এখনও পঁয়ত্রিশ মিনিট সময় আছে। আর দেরি করা চলে না।'

আমরা দু'জনে মেশিনের ঘরে গিয়ে হাজির হলাম। এনরিকো বলল, 'দশ মিনিটের বেশি কিন্তু সময় দিতে পারব না তোমাকে।'

আমি বললাম, 'তাতেই হবে।'

প্লাস্টিকের খাঁচার মধ্যে দাঁড়ালাম। এবার আমি নিজেই বোতাম টিপলাম। দশ সেকেন্ড পরে দেখলাম যে আমি মিলানের বিখ্যাত ক্যাথিড্রালের পাশে দাঁড়িয়ে আছি। তারপর আমার ইচ্ছার জোরে রন্ডির প্রাসাদে আমার শোবার ঘরে পৌঁছে এক অদ্ভুত দৃশ্য দেখে স্তম্ভিত হয়ে গেলাম।

আমি দেখলাম আমি, অর্থাৎ ত্রিলোকেশ্বর শঙ্কু, অবসন্ন দেহে আমার ঘরে খাটের উপর শুয়ে আছি। দেখেই বুঝতে পারলাম, আমি বেশ গুরুতর ভাবে অসুস্থ। ঘরময় আমার জিনিসপত্র ছড়ানো, সেখানে কেউ যেন তাণ্ডব নৃত্য করেছে, যদিও কেন, সেটা বুঝতে পারলাম না।

আমার চেহারা দেখে মায়া হলেও কিছু করার উপায় নেই। এ পাশ ও পাশ ঘুরে ছটফট করছি; একবার উঠে বসেই তৎক্ষণাৎ শুয়ে পড়লাম, তারপর মাথা চাপড়ালাম। গভীর আক্ষেপে যেন আমার বুক ফেটে যাচ্ছে।

হঠাৎ ঘরের দরজায় একটা টোকা পড়ল। খাটে শোয়া মানুষটা দরজার দিকে চাইল, আর পরক্ষণেই ঘরে প্রবেশ করল রন্ডি। তার চোখের নির্মম চাহনি দেখে আমার রক্ত জল হয়ে গেল।

'আজ ডিনারে তোমার খাবার জলে একটু বেশি করে বিষ মিশিয়ে দিয়েছিলাম,' বলল রন্ডি, 'যাতে এবার আর মাথা তুলতে না পার। বুঝতেই পারছ, তুমি বেঁচে থেকে আরেকটা টাইম মেশিন তৈরি করে আমার ব্যবসায় ব্যাগড়া দাও, সেটা আমি চাই না। আমি চাই মিলানেই তোমার ইহলীলা সাঙ্গ হোক। কোনও কোনও ভাইরাস ইনফেকশনে এখন লোক মরছে, কারণ তার সঠিক ওষুধ ডাক্তারে এখনও জানে না। তুমিও তাতেই মরবে। চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে—'

দৃশ্য শেষ হয়ে দ্রুত অন্ধকার পর্দা নেমে এল।

আমি আবার মেশিনের ঘরে।

'সরি, প্রোফেসর,' বলল এনরিকো। 'দশ মিনিট হয়ে গেছে; এবার পালাতে হয়।'

বিপদ থেকে রক্ষা পাব কি না সেটা জানতে না পারলেও, বিদ্যুৎ ঝলকের মতো একটা চিন্তা আমার মাথায় এসেছে এইমাত্র, সেটা এতই চাঞ্চল্যকর যে, আমার হাত কাঁপতে শুরু করে দিয়েছে।

'কী হল, প্রোফেসর শঙ্কু?' জিজ্ঞেস করল এনরিকো।

আমি কোনওরকমে নিজেকে সংযত করে বললাম, 'একটা বুদ্ধি আমার মাথায় এসেছে। দুটো কাজ করা দরকার। একটা হল আমার বন্ধু ক্রোলকে ম্যুনিখে ফোন করা।'

'আর দ্বিতীয়?'

'দ্বিতীয় কাজটা তোমাকেই করতে হবে। এতে একটু সাহসের প্রয়োজন হবে—যেটা তোমার আছে বলে আমি বিশ্বাস করি।'

'কী কাজ?'

'আমি রন্ডির স্টাডিতে দেখেছি তার পাইপের বিরাট সংগ্রহ। কম করে কুড়ি-বাইশখানা পাইপ বাইরেই রাখা আছে। তার থেকে একটা নিয়ে পুলিশে দিতে হবে আঙুলের ছাপের জন্য। পারবে?'

'অতি সহজ কাজ,' বলল এনরিকো। 'পুলিশে আমার চেনা লোক আছে। এ বাড়িতে পুলিশের পাহারার বন্দোবস্ত সব আমাকেই করতে হয়েছিল।'

'ব্যস, তা হলে আর চিন্তা নেই।'

আমরা দু'জনে যে যার ঘরে চলে গেলাম। এনরিকো প্রতিশ্রুতি দিল যে, বিকেলের মধ্যে রন্ডির পাইপ তার হাতে চলে আসবে, এবং সে তৎক্ষণাৎ চলে যাবে পুলিশ স্টেশনে।

আমি ঘরে চলে এসে ক্রোলকে ফোন করে যা বলার তা বলে দিলাম। তার সাহায্য বিশেষ ভাবে দরকার, তা না হলে আমার উদ্দেশ্য-সিদ্ধি হবে না। বলা বাহুল্য ক্রোলও কথা দিল যে তার দিক থেকে কোনও ত্রুটি হবে না।

এই সব ঘটনা ঘটেছে গত পরশু, অর্থাৎ কুড়ি তারিখে।

গতকাল একুশে সকালে কোনও উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটেনি। তবে একটা ব্যাপারের উল্লেখ করতেই হয়। রন্ডি আমার শারীরিক অবস্থা সম্পর্কে ক্রমাগত প্রশ্ন করে চলেছে। আমি অনুমান করছি যে সে আমাকে বিষ খাইয়েই চলেছে, কিন্তু আমিও সমানে আমার ওষুধ খেয়ে বিষের প্রতিক্রিয়াকে নাকচ করে দিয়ে শরীরটাকে দিব্যি মজবুত রেখে দুর্বলতার অভিনয় করে চলেছি।

এর ফলে রন্ডির মনে কোনও সন্দেহের উদ্রেক হচ্ছে কি না সে চিন্তা আমার মনে



এসেছিল, কিন্তু রন্ডিও চালাক বলে সেটা সে আমায় বুঝতে দেয়নি। গতকাল লাঞ্চের পর জানতে পারলাম তার শয়তানির দৌড়।

খাওয়া সেরে ঘরে এসে মিরাকিউরল খেতে গিয়ে দেখি বোতলটা যেখানে থাকার কথা— অর্থাৎ আমার হাতব্যাগে—সেখানে নেই।

আমি চোখে অন্ধকার দেখলাম। বিষের প্রভাবকে ঠেকিয়ে রাখতে না পারলে আমার চরম বিপদ।

পাগলের মতো সারা ঘরময় ওষুধ খুঁজে বেড়াচ্ছি, যদিও জানি যে, ওটা ব্যাগে ছাড়া আর কোথাও থাকতে পারে না।

শেষটায় অসহায় বোধে এনরিকোর ঘরে ফোন করলাম, কিন্তু সেও ঘরে নেই। বেশ বুঝতে পারছি এবার শরীর সত্যি করেই অবসন্ন হয়ে আসছে। হয়তো বিষের মাত্রা আজ থেকে বাড়িয়ে দিয়েছে রন্ডি, যাতে অল্পদিনের মধ্যে সে ল্যাঠা চুকিয়ে ফেলতে পারে।

অবশেষে শয্যা নিতে বাধ্য হলাম। সমস্ত গায়ে ব্যথা করছে, হাত-পা অবশ, মাথা ঝিম ঝিম।

এই অবস্থায় কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছি জানি না। যখন ঘুম ভাঙল তখন সন্ধ্যা হয়ে গেছে।

আবার এনরিকোকে ফোন করলাম। সে এখনও ঘরে ফেরেনি।

সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারছি না, পা টলছে। তাই আবার বিছানায় শুয়ে পড়লাম। দৃষ্টি যেন একটু ঘোলাটে। মৃত্যু কি এর মধ্যেই ঘনিয়ে এল? টেবিলের ওপর ট্র্যাভেলিং ক্লকটার দিকে

চাইলাম। ন'টা। তার মানে তো এখন—

হ্যাঁ, ঠিকই দেখেছিলাম টাইম মেশিনে। দরজায় টোকা মেরে ঘরে ঢুকে রন্ডি তার শাসানি শুরু করল। এ-সব কথা আমি কালই শুনেছি, আজ আরেকবার শুনতে হল।

'কোনও কোনও ভাইরাস ইনফেকশনে এখন লোক মরছে, কারণ তার সঠিক ওষুধ ডাক্তারেরা এখনও জানে না। তুমিও তাতেই মরবে। চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যেই সব শেষ হয়ে যাবে বলে আমার বিশ্বাস। তারপর লুইজি রন্ডি টাইম মেশিনের একচ্ছত্র সম্রাট। টাকার আমার অভাব নেই, কিন্তু টাকার নেশা বড়—'

খট খট খট!—

রন্ডি চমকে উঠল। সে দরজাটা ভিতর থেকে বন্ধ করে দিয়েছে।

খট খট খট!—

রন্ডি নড়ছে না তার জায়গা থেকে। তার মুখ ফ্যাকাশে, দৃষ্টি বিস্ফারিত।

আমি সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করে বিছানা থেকে উঠে টলতে টলতে গিয়ে রন্ডিকে এক ধাক্কায় সরিয়ে দরজাটা খুলে নিস্তেজ ভাবে মেঝেতে লুটিয়ে পড়লাম।

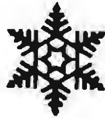
ঘরে ঢুকে এল সশস্ত্র পুলিশ।

ক্রোল ও এনরিকো সত্যিই আমার বন্ধুর কাজ করেছে। সেদিন টাইম মেশিনের সাহায্যে যখন ক্লাইবারের ঘরে যাই, তখন দেখেছিলাম ক্লাইবারের লাইটার দিয়ে রন্ডি নিজের সিগারেট ধরাচ্ছে। হয়তো সে ভেবেছিল যে, লাইটারটা সঙ্গে করে নিয়ে যাবে, কিন্তু তাড়াহুড়োতে সেটা তার মনে পড়েনি। আর আমি নিজের চোখে ব্যাপারটা দেখেও খেয়াল করিনি। খেয়াল হওয়ামাত্র ক্রোলকে সেটা জানিয়ে দিয়ে বলি যে লাইটারে খুনির আঙুলের ছাপ পাওয়া যাবে, এবং সে ছাপ রন্ডির পাইপের ছাপের সঙ্গে মিলে যাবে।

শেষপর্যন্ত তাই হল।

আর আমার মিরাকিউরল পাওয়া গেল রন্ডির ঘরে, এবং সেটা খেয়ে শরীর সম্পূর্ণ সারিয়ে নিতে লাগল চার ঘণ্টা।

আনন্দমেলা। পূজাবার্ষিকী ১৩৯২



শঙ্কু ও আদিম মানুষ

এপ্রিল ৭

নৃতত্ত্ববিদ ডা. ক্লাইনের আশ্চর্য কীর্তি সম্বন্ধে কাগজে আগেই বেরিয়েছে। ইনি দক্ষিণ আমেরিকায় আমাজনের জঙ্গলে ভ্রমণকালে এক উপজাতির সন্ধান পান, যারা নাকি ত্রিশ লক্ষ বছর আগে মানুষ যে অবস্থায় ছিল আজও সেই অবস্থাতেই রয়েছে। এটা একটা যুগান্তকারী আবিষ্কার। শুধু তাই নয়; সার্কাস বা চিড়িয়াখানার জন্য যে ভাবে জানোয়ার ধরা হয়, সেইভাবেই এই উপজাতির একটি নমুনাকে ধরে খাঁচায় পুরে ক্লাইন নিয়ে আসেন তাঁর

বাসস্থান পশ্চিম জার্মানির হামবুর্গ শহরে। খবরের কাগজে এই মানুষের ছবি আমি দেখেছি। বানরের সঙ্গে তফাত করা খুব কঠিন, যদিও দুই পায়ে হাঁটে। তারপর থেকে ক্লাইনের বিশ্বজোড়া খ্যাতি। এই আদিম মানুষটি এখনও ক্লাইনের বাড়িতে খাঁচার মধ্যেই রয়েছে। কাঁচা মাংস খায়, মুখ দিয়ে জান্তব শব্দ করে, স্বভাবতই কোনও ভাষা ব্যবহার করে না, আর অধিকাংশ সময় ঘুমোয়। আমার ভীষণ ইচ্ছা হচ্ছিল একবার এই আদিমতম মানবের নমুনাটিকে দেখার; সে ইচ্ছা যে পূরণ হবার সম্ভাবনা আছে তা ভাবিনি। কিন্তু সে সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। কাল ক্লাইনের কাছ থেকে একটা চিঠি পেয়েছি। ক্লাইন লিখছে—

প্রিয় প্রোফেসর শঙ্কু,

ইনভেন্টর হিসেবে তোমার খ্যাতি আজ বিশ্বজোড়া। সব দেশের বিজ্ঞানীরাই তোমাকে সম্মান করে। আমি যে আদিমতম মানুষের—যাকে বলা হয় হোমো অ্যাফারেনসিস—একটি নমুনা সংগ্রহ করেছি সে খবর হয়তো তুমি কাগজে পড়েছ। আমি চাই তুমি একবার আশ্চর্য মানুষটিকে এসে দেখে যাও। আমি জানি তুমি বছরে অন্তত একবার ইউরোপে আসো। এ বছর কি তোমার আসার সম্ভাবনা আছে? যদি থাকে তো আমাকে জানিয়ো। যেখানেই থাক না কেন, সেখান থেকে তোমাকে আমি হামবুর্গ আসার আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। সব খরচ আমার। যে সময় তুমি আসবে, সে সময় আমি আরও কয়েকজন বৈজ্ঞানিককে ডাকতে চাই। এমন আশ্চর্য আদিম প্রাণী দেখার সুযোগ তোমাদের আর হবে না। আমরা যখন যাই, তখন এই প্রাণীর আর মাত্র বারোজন অবশিষ্ট ছিল। তারাও আর বেশিদিন বাঁচবে না। আর অন্য কোনও দলও যে সেখানে গিয়ে তাদের দেখা পাবে, এ সম্ভাবনাও কম, কারণ পথ অত্যন্ত দুর্গম আর নানারকম হিংস্র প্রাণীতে ভর্তি। আমার তরুণ বন্ধু বিশিষ্ট বৈজ্ঞানিক হেরমান বুশ তো নৌকো থেকে নদীর জলে পড়ে কুমিরের খাদ্যে পরিণত হয়। আমাদের নেহাত ভাগ্য যে আমরা প্রাণ নিয়ে ফিরেছি।

যাই হোক, তুমি কী স্থির কর আমাকে অবিলম্বে জানিও।

হাইনরিখ ক্লাইন

আগামী সেপ্টেম্বর আমার জিনিভাতে একটা কনফারেন্সে নেমন্তন্ন আছে। যাওয়া নিয়ে দ্বিধা করেছিলাম—বয়স হয়ে গেছে—জেটে ঘোরাঘুরির ধকল আর সয় না—কিন্তু ক্লাইনের এই আমন্ত্রণের জন্য জিনিভাতে যাব বলে স্থির করেছি। এ সুযোগ ছাড়া যায় না। অ্যাদ্দিন যে সমস্ত মানুষের শুধু হাড়গোড়ের জীবাশ্ম বা ফসিল পাওয়া গিয়েছিল, সেই মানুষ জ্যান্ত দেখতে পাব এ কি কম সৌভাগ্য!

এখানে বলে রাখি ক্লাইনের তরুণ সহকর্মী হেরমান বুশের সঙ্গে আমার বছরপাঁচেক আগে ব্রেমেন শহরে আলাপ হয়। ছেলেটি ছিল এক অসাধারণ মেধাবী জীবতাত্ত্বিক। তার এ হেন মৃত্যু আমাকে মর্মাহত করেছিল। ক্লাইনের সঙ্গে আমার আলাপ হবার সুযোগ হয়নি। শুনেছি সে অতি সজ্জন ব্যক্তি। নৃতত্ত্ব নিয়ে তার অনেক মৌলিক গবেষণা আছে।

মুশকিল হচ্ছে আমাকে সেপ্টেম্বরে বাইরে যেতে হলে আমার একটা কাজ হয়তো আমি শেষ করে যেতে পারব না। অবিশ্যি এলিক্সিরামের অভাবে এমনিও আমি আর খুব বেশি দূর অগ্রসর হতে পারব বলে মনে হয় না। আসলে আমি একটা ড্রাগ প্রস্তুতের ব্যাপারে একটা পরীক্ষা চালাচ্ছিলাম। এই ড্রাগ তৈরি হলে চতুর্দিকে সাড়া পড়ে যেত। এর সাহায্যে একজন মানুষের ক্রমবিবর্তনের মাত্রা লক্ষগুণ বাড়িয়ে দেওয়া যায়। অর্থাৎ একজন মানুষকে এই ড্রাগ ইনজেক্ট করলে পাঁচ মিনিটের ভিতর তার মধ্যে দশ হাজার বছর বিবর্তনের চেহারা দেখা



যেত। ওষুধ আমি তৈরি করেছি। প্রথমবার আমার চাকর প্রহ্লাদের উপর প্রয়োগ করে কোনও ফল পাইনি। তারপর এলিক্সিরামের মাত্রা একটু বাড়িয়ে দিয়ে আবার ইনজেক্ট করাতে দেখি প্রহ্লাদ অত্যন্ত জটিল গাণিতিক বিষয় নিয়ে বক্তৃতা দিতে আরম্ভ করেছে।

কিন্তু এই অবস্থা বেশিক্ষণ টেঁকেনি। দশ মিনিটের মধ্যে প্রহ্লাদ ঘুমিয়ে পড়ে। তারপর ঘুম যখন ভাঙে তখন দেখি সে আবার যেই কে সেই অবস্থায় ফিরে এসেছে। বলল, 'আপনি সুই দেবার পর মাথাটা ভোঁভোঁ করছিল। আমি বোধ হয় ভুল বকছিলাম, তাই না?'

আমার কাছে এলিক্সিরাম আর নেই। গত বছর জাপান থেকে এক শিশি এনেছিলাম। এই ড্রাগটিও মাত্র বছরতিনেক আবিষ্কার হয়েছে। অত্যন্ত শক্তিশালী ড্রাগ এবং দামও অনেক। তবে প্রহ্লাদের উপর প্রয়োগের ফলে যেটুকু ফল পেয়েছিলাম তাতেই যথেষ্ট উৎসাহিত বোধ করেছিলাম। ভবিষ্যতের মানুষের মস্তিষ্কের আয়তন বাড়বে তাতে আমার সন্দেহ নেই। তার পরের অবস্থায় হয়তো দীর্ঘকাল যন্ত্রের উপর নির্ভরের ফলে অঙ্গপ্রত্যঙ্গ দুর্বল হয়ে আসবে, কিন্তু নতুন নতুন যন্ত্র উদ্ভাবনের তাগিদে মস্তিষ্ক বেড়েই চলবে। অবিশ্যি এসব ঘটতে সময় লাগবে অনেক। বিবর্তনের ফলে রূপান্তরের চেহারা ধরা পড়তে পড়তে বিশ-পঁচিশ হাজার বছর পেরিয়ে যায়।

আমার ওষুধটা তৈরি হলে ভবিষ্যৎ মানুষ সম্বন্ধে আর অনুমান করতে হবে না; চোখের সামনে দেখতে পাব মানুষ কী ভাবে বদলাবে।

ক্লাইনের চিঠির জবাব আমি দিয়ে দিয়েছে। তাতে এও লিখেছি যে, আমার দুই বন্ধু ক্রোল আর সন্ডার্সকে সে যদি আমন্ত্রণ জানায় তা হলে খুব ভাল হয়, কারণ এদের দু'জনই স্ব স্ব ক্ষেত্রে অপ্রতিদ্বন্দ্বী। ক্রোল হল নৃতাত্ত্বিক আর সন্ডার্স জীববিদ্যা বিশারদ। আমার যাওয়া সেপ্টেম্বরের দ্বিতীয় সপ্তাহে। প্রথমে জিনিভা, তারপর হামবুর্গ।

সেপ্টেম্বর ১০

আজ আমি জিনিভা রওনা দিচ্ছি। ক্রোল আর সন্ডার্স দু'জনেরই চিঠি বেশ কিছুদিন হল পেয়েছি। দু'জনকেই ক্লাইন আমন্ত্রণ জানিয়েছে। ক্রোলকে আমার ড্রাগের কথা লিখেছিলাম। সে উত্তরে লিখেছে,

'তোমার ওষুধ যে অবস্থায় রয়েছে সে অবস্থায়ই সঙ্গে করে নিয়ে এসো। ইউরোপের যে কোনও বড় শহরে এলিক্সিরাম পাওয়া যায়। হয়তো ক্লাইনের কাছেই থাকতে পারে। একই সঙ্গে অতীত ও ভবিষ্যতের মানুষকে দেখতে পারলে একটা দারুণ ব্যাপার হবে। ক্লাইন লোকটাকে আমার বেশ ভাল লাগে। আমার বিশ্বাস, সে নিশ্চয়ই তোমাকে তার ল্যাবরেটরিটা ব্যবহার করতে দেবে।'

আমি তাই সঙ্গে করে আমার ওষুধ এভলিউটিন-এর শিশিটা নিয়ে যাচ্ছি। সুযোগ পেলে প্রস্তাবটা ক্লাইনকে দেব।

সেপ্টেম্বর ১৬, হামবুর্গ

জিনিভার কাজ শেষ করে কাল হামবুর্গ পৌঁছেছি। অন্য অতিথিরাও একই দিনে এসেছে। ক্রোল আর সন্ডার্স ছাড়া আছে ফরাসি ভূতাত্ত্বিক মিশেল রামো, ইটালিয়ান পদার্থবিজ্ঞানী মার্কো বার্তেল্লি আর রুশ স্নায়ুবিশেষজ্ঞ ডা. ইলিয়া পেট্রফ।

আমি পৌঁছেছি রাত্রে। ক্লাইন আমাকে অভিবাদন জানিয়ে বলল, 'আমার সে মানুষ সন্ধ্যা থেকেই ঘুমোয়। ত্রিশ লক্ষ বছর আগে আদিম মানুষও তা-ই করত বলে আমার বিশ্বাস। আমি তাই কাল সকালে তোমাদের সকলকে তার কাছে নিয়ে যাব।'

আমি আর ল্যাবরেটরির কথাটা তুললাম না। দু'-একদিন এখানে থাকি, তারপর বলব। তবে তার সহকর্মীর মৃত্যুতে সমবেদনা জানানোর কথাটা ভুলিনি। তাকে যে আমি ব্যক্তিগতভাবে চিনতাম, সে কথাও বললাম। ক্লাইন বলল যে, অষ্টাদশ শতাব্দীর এক স্প্যানিশ পর্যটকের লেখা একটা অত্যন্ত দুষ্প্রাপ্য ভ্রমণকাহিনীতে নাকি ব্রেজিলের এই উপজাতির উল্লেখ আছে। লেখক বলেছেন, তারা বাঁদর ও মানুষের ঠিক মাঝের অবস্থায় রয়েছে। এতদিন আগের এই আশ্চর্য সিদ্ধান্ত ক্লাইনকে বিশেষভাবে আকর্ষণ করেছিল। এই বিবরণই ক্লাইনকে টেনে নিয়ে যায় আমাজনের গভীর জঙ্গলে। সেটা যে সফল হবে তা সে কল্পনাও করতে পারেনি।

নৈশভোজের কোনও ত্রুটি হল না। পুরনো বন্ধুদের সঙ্গে দেখা হওয়া ছাড়াও তিনজন অচেনা বৈজ্ঞানিকের সঙ্গে আলাপ করেও খুব ভাল লাগল। বার্তেল্লি, রামো আর পেট্রফ তিনজনেই আদিমতম মানুষটিকে দেখার জন্য উদ্‌গ্রীব হয়ে আছে। সকলেই স্বীকার করল যে,

এ একটি আশ্চর্য আবিষ্কার, আর আমাজনের জঙ্গল এক অতি আশ্চর্য জায়গা।

পেট্রফ ক্লাইনকে প্রশ্ন করল, 'তুমি কি এই মানুষটিকে সভ্যতার পথে খানিকটা এগিয়ে নিয়ে যাবার কোনও চেষ্টা করছ?'

ক্লাইন বলল, 'যে মানুষ প্রায় ত্রিশ লক্ষ বছর আগের অবস্থায় রয়েছে, তাকে কিছু শেখানো যাবে বলে মনে হয় না। সবচেয়ে আশ্চর্য এই যে, এতদিন এসব মানুষের ফসিল পাওয়া গিয়েছিল দক্ষিণ আফ্রিকায়, আর আসল মানুষটি পাওয়া গেল দক্ষিণ আমেরিকায়।'

'ওকে রেখেছ কীভাবে?' বার্তেল্লি জিজ্ঞেস করল।

'আমারই কম্পাউন্ডে একশো গজ ব্যাসের একটি শিক দিয়ে ঘেরা জায়গা করে তার মধ্যে রেখেছি। ঘরের মধ্যে খাঁচার ভিতর রাখার ইচ্ছে আমার আদৌ ছিল না। প্রাকৃতিক পরিবেশে ও দিব্যি আছে। ওর দলের লোকের অভাব বোধ করার কোনও লক্ষণ এখনও দেখিনি। ওর রক্ষণাবেক্ষণের জন্য একটি সশস্ত্র লোক রাখতে হয়েছে। এমনিতে ও কোনও হিংস্র ভাব দেখায় না, কিন্তু আমি জানি ওর শারীরিক শক্তি প্রচণ্ড। একটা গাছের মোটা ডাল সে হাত দিয়ে মট করে ভেঙে দিয়েছিল।'

'ওর মধ্যে সুখদুঃখ জাতীয় অভিব্যক্তির কোনও লক্ষণ দেখেছ?' আমি প্রশ্ন করলাম।

'না,' বলল ক্লাইন। 'ও শুধু মাঝে মাঝে মুখ দিয়ে একরকম শব্দ করে যার সঙ্গে গোরিলার হুংকারের কিছুটা মিল আছে।'

'চার পায়ে আদৌ হাঁটে কি?'

'না। এ যে মানুষ তাতে কোনও সন্দেহ নেই। সব সময় দু' পায়েই হাঁটে। ফলমূল খায়, মাংসও খায়। তবে মাংসটা খায় কাঁচা, ঝলসে নয়। এ মানুষ এখনও আগুনের ব্যবহার শেখেনি। একদিন ওর সামনে আগুন জ্বালিয়ে দেখেছি, ও চিৎকার করে দূরে পালিয়ে যায়।'

সাড়ে দশটা নাগাদ আমরা যে যার ঘরে চলে গেলাম। অতিথিসৎকারের কোনও ত্রুটি করেনি ক্লাইন, এটা স্বীকার করতেই হবে।

সেপ্টেম্বর ১৭, রাত ১১টা

আজ বিচিত্র অভিজ্ঞতা। আমরা ছয়জন বৈজ্ঞানিক আজ একটি জ্যান্ত 'হোমো অ্যাপারেনিসস'-কে দেখলাম। দু' পায়ে না হাঁটলে ওকে বাঁদর বলেই মনে হত। সর্বাঙ্গ খয়েরি লোমে ঢাকা। ক্লাইন মানুষটাকে একটা হাফপ্যান্ট পরিয়ে তার মধ্যে খানিকটা সভ্য ভাব আনবার চেষ্টা করেছে, আর কাছেই ফেলে রেখেছে একটা ভাল্লুকের লোম—শীত লাগলে গায়ে জড়াবার জন্য। সেটা নাকি এখনও পর্যন্ত ব্যবহার করার কোনও দরকার হয়নি। মাটিতে একটা সিমেন্ট করা গর্তে জল রাখা রয়েছে, সেটা তৃষ্ণা নিবারণের জন্য। আমাদের সামনেই প্রাণীটা তার থেকে জল খেল জানোয়ারের মতো করে। তারপর আমাদের এতজনকে একসঙ্গে দেখেই বোধ হয় একটা চেস্টনাট গাছের পিছনে গিয়ে কিছুক্ষণ লুকিয়ে থেকে তারপর অতি সন্তর্পণে আবার বেরিয়ে এল।

ক্লাইন বোধ হয় ইচ্ছা করেই চারিদিকে ছোটবড় পাথরের টুকরো ছড়িয়ে রেখেছে। মানুষটা এবার তারই একটা হাতে নিয়ে এদিকে ওদিকে ছুড়ে যেন খেলা করতে লাগল।

সত্যি, এমন দৃশ্য কোনওদিন দেখব তা স্বপ্নেও ভাবিনি। পেট্রফ তার ক্যামেরা দিয়ে কিছু ছবি তুলল। যদিও লোকটা বিশ গজের বেশি কাছে আসছে না।

আমরা থাকতে থাকতেই সশস্ত্র প্রহরী একটা প্লাস্টিকের বালতিতে কাঁচা গোরুর মাংস নিয়ে গিয়ে মানুষটাকে খেতে দিল। তার চোয়ালের জোর সাংঘাতিক, সেটা চোখের সামনেই



দেখতে পেলাম।

দুপুরে লাঞ্চ খেতে খেতে ক্রোল একটা কথা বলল ক্লাইনকে।

'তোমার এই মানুষটি যে নেটা বা লেফট্‌-হ্যান্ডেড, সেটা লক্ষ করেছ বোধহয়।

সেটা আমিও লক্ষ করেছিলাম। সে পাথরগুলো বাঁ হাত দিয়ে তুলছিল। ক্লাইন বলল, 'জানি। ওটা আমি প্রথম দিনই লক্ষ করেছি।'

রামো বলল, 'তোমার এই আদিম মানুষের চাহনিতে কিন্তু একটা বুদ্ধির আভাস আছে; যেভাবে সে আমাদের দিকে চেয়ে চেয়ে দেখছিল—'

ক্লাইন কথার পিঠে কথা চাপিয়ে বলল, 'তার মানেই বুঝতে হবে হোমো অ্যাফারেনসিসকে আমরা যত বোকা ভাবতাম, আসলে সে তত বোকা নয়। চার পা থেকে দু'পায়ে হাঁটবার সঙ্গে সঙ্গেই তার মস্তিষ্কের আয়তনও নিশ্চয়ই বেড়ে গিয়েছিল।'

আমি এইবার ক্লাইনকে অনুরোধ করলাম তার ল্যাবরেটরিটা দেখবার জন্য। ক্লাইন খুশি হয়েই সম্মত হল। বলল, 'বেশ তো, খাবার পরেই না হয় যাওয়া যাবে।'

লাঞ্চের শেষে চমৎকার ব্রেজিলিয়ান কফি খাইয়ে ক্লাইন আমাদের নিয়ে গেল তার গবেষণাগার দেখাতে। যন্ত্রপাতি ওষুধপত্রে পরিপূর্ণ ল্যাবরেটরি, দেখে মনে হল সেখানে যে কোনওরকম এক্সপেরিমেন্ট চালানো যায়। সবচেয়ে ভাল লাগল দেখে যে, ল্যাবরেটরির একপাশে একটা সেলফে অনেকগুলি শিশি বোতলের মধ্যে তিনটে পাশাপাশি শিশিতে এলিক্সিরাম রয়েছে। অবিশ্যি আমার ড্রাগের কথা এখনও ক্লাইনকে বলিনি।

রাত্রে ডিনার খেয়ে কিছুক্ষণ গল্প করে পরস্পরকে গুড নাইট জানিয়ে যে যার ঘরে চলে গেলাম। আমার মনে কীসের জন্য জানি একটা খটকা লাগছে, অনেক ভেবেও তার কোনও কারণ খুঁজে পাচ্ছি না। এমন সময় দরজায় টোকা পড়ল। ঘড়িতে দেখি পৌনে এগারোটা। এত রাত্রে কে?

দরজা খুলে দেখি ক্রোল আর সন্ডার্স। ব্যাপার কী?

ক্রোল বলল, 'আমি যে ঘরে রয়েছি সে ঘরে নিশ্চয়ই কোনওসময় হেরমান বুশ ছিল। কারণ তার একটা খাতা একটা দেরাজের মধ্যে পেলাম।'

'কী আছে সে খাতায়?'

'যা আছে তা পড়লে মন খারাপ হয়ে যায়। আমাজনের জঙ্গলে নদীপথে সাড়ে তিনশো মাইল যাবার পরেও আদিম মানুষের দেখা না পেয়ে ক্লাইন নাকি হাল ছেড়ে দিয়েছিল। বুশই তাকে উৎসাহ দিয়ে নিয়ে যায়। সে বলে যে, স্প্যানিশ পর্যটকের বিবরণ কখনও ভুল হতে পারে না। কিন্তু—'

'কিন্তু কী?'

'বুশের মনে একটা সংশয় দেখা দিয়েছিল। তার মন বলছিল যে, সে এই অভিযানের শেষ দেখে যেতে পারবে না। সে বলছে যে, তার মধ্যে যে একটা ভবিষ্যৎ দর্শনের অলৌকিক ক্ষমতা আছে সেটা সে অনেক সময় লক্ষ করেছে। ক্লাইনের মধ্যে কোনও সংশয় ছিল না; প্রাণের ভয় সে কখনই করেনি। সে অত্যন্ত সাহসী ছিল। জাহাজে যেতে যেতেও সে একাগ্রমনে একটা এক্সপেরিমেন্ট চালিয়ে যাচ্ছিল।'

'কী এক্সপেরিমেন্ট?'

'সেটা বুশ বলেনি। বুশ নিজেও জানত বলে মনে হয় না।'

'বেচারি বুশ!'

বুশের মৃত্যুতে এমনিই আমি আঘাত পেয়েছিলাম, এ খবরে মনটা আরও বেশি খারাপ হয়ে গেল।

'শুধু তাই নয়,' বলল ক্রোল। 'ক্লাইন যে একটা যুগান্তকারী আবিষ্কার করে বিশ্ববিখ্যাত হয়ে যাবে সেটাও বুশ বুঝতে পেরেছিল। তাই সে আরও চাইছিল যাতে ক্লাইন না পিছু হটে।'

সন্ডার্স কিছুক্ষণ থেকে একটু অন্যমনস্ক ছিল। আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম সে কী ভাবছে। সে বলল, 'কিছুই না। একটা সামান্য খটকা। আমার ধারণা ছিল আদিম মানুষ বুঝি বেঁটে হয়, কিন্তু এ দেখছি প্রায় পাঁচ ফুট ন' ইঞ্চির কাছাকাছি।'

আমি বললাম, 'তার কারণ আর কিছুই নয়; এ মানুষ আদিম হলেও আসলে সে বিংশ শতাব্দীর প্রাণী। এর সব লক্ষণ হোমো অ্যাফারেনসিসের সঙ্গে মিলবে এটা মনে করা ভুল।'

'তা বটে।'

রাত হয়েছিল। তাই আমাদের কথা বেশিদূর এগোল না। ক্রোল বিদায় নেবার সময় বলে গেল, 'এবার তোমার ড্রাগের কথাটা ক্লাইনকে বলো। ওর এলিক্সিরাম তো তোমার লাগবে।



সে ব্যাপারে আশা করি ও কোনও আপত্তি করবে না।'

পরিণামে কী আছে জানি না, কিন্তু কাল সকালেই ক্লাইনকে আমার ড্রাগটা সম্বন্ধে বলতে হবে।

সেপ্টেম্বর ১৮

আজ সকালে ব্রেকফাস্টের টেবিলে সকলের সামনে আমার এভিলিউটিন-এর কথাটা বললাম। আমার চাকরের উপর পরীক্ষা করে কী ফল হয়েছে সেটাও জানালাম, আর সব শেষে ক্লাইনের কাছে আমার আর্জি পেশ করলাম।—'তোমার এলিক্সিরামের এক চামচ পেলেই মনে হয় আমার কাজটা সফল হবে। তার জন্য যা দাম লাগে, আমি দিতে রাজি।'

ক্লাইন দেখলাম রীতিমতো অবাক হল আমার ওষুধটার কথা শুনে। বলল, 'এক চামচ এলিক্সিরামের জন্য দাম দেবার কথা বলছ? কীরকম মানুষ তুমি? কিন্তু এই ওষুধ তৈরি হলে তুমি কার উপর পরীক্ষা করবে? সে লোক কোথায়?'

আমি হেসে বললাম, 'কেন, তোমার হোমো অ্যাফারেনসিস তো রয়েছে। তার উপর পরীক্ষা করলে সে আধ ঘণ্টার মধ্যে আধুনিক মানুষ হোমো স্যাপিয়েনসে পরিণত হবে।'

আমি ঠিক জানি না, কিন্তু মনে হল আমার কথাটা শুনে ক্লাইনের চোখে একটা ঝিলিক

খেলে গেল। সে বলল, 'এর অ্যান্টিডোট তুমি তৈরি করেছ, যাতে সেটা খাইয়ে মানুষকে আবার পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে আনা যায়?'

আমি মাথা নেড়ে বললাম, 'সে ব্যবস্থাও আছে।'

'তুমি দেখছি খুব থরো,' বলল ক্লাইন। 'যাই হোক, আমার একটা ব্যাপার আছে, সেটা আমি বলিনি—আমি জ্যোতিষে বিশ্বাস করি। আজকের দিনটা এই জাতীয় পরীক্ষার পক্ষে ভাল নয়। তোমাকে আমি এলিক্সিরাম দেব কাল। কাল সকালে।'

ব্রেকফাস্টের পর আমরা আবার আদিম মানুষটিকে দেখতে গেলাম। আজ দেখলাম তার ভয় অনেকটা কমে গেছে। সে আমাদের দশ হাতের মধ্যে এগিয়ে এসে আমাদের দিকে চেয়ে দেখতে লাগল। আমার উপর দৃষ্টি রাখল প্রায় দু'মিনিট। তারপর মুখ দিয়ে একটা রুক্ষ শব্দ করল, যদিও তার মধ্যে রাগের কোনও চিহ্ন ছিল না।

আমার মন থেকে কিন্তু খটকা যাচ্ছে না। অ্যাফারেনসিসের এই বিশেষ নমুনাটিকে দেখলেই আমি কেমন যেন অন্যমনস্ক হয়ে পড়ি। কেন তা বলতে পারব না। হয়তো বয়সের সঙ্গে আমার চিন্তাশক্তিও কিছুটা হ্রাস পেয়েছে।

সেপ্টেম্বর ১৮, রাত দশটা

আজ ডিনার খাবার পর থেকে গা-টা কেমন গুলোচ্ছিল। শুধু গা গুলোচ্ছিল বললে ভুল হবে, সেইসঙ্গে মাথাটাও কেমন জানি গোলমাল লাগছিল, চিন্তা ওলটপালট হয়ে যাচ্ছিল। আমার সঙ্গে আমারই তৈরি আশ্চর্য ওষুধ মিরাকিউরল ছিল। তার এক ডোজ খেয়ে কিছুক্ষণের মধ্যে আবার স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে এলাম। এরকম আমার কখনও হয় না। আজ কেন হল?

দশ মিনিটের মধ্যে দরজায় টোকা পড়ল। খুলে দেখি সন্ডার্স আর ক্রোল। ক্রোল বলল, 'আজ ডিনারে আমাদের পানীয়তে বোধ হয় কিছু মেশানো ছিল। মাথাটা ঘুরছে, চিন্তা সব গোলমাল হয়ে যাচ্ছে।'

সন্ডার্স বলল, 'আমারও সেই অবস্থা।'

আমি দু'জনকেই মিরাকিউরল খাইয়ে সুস্থ করলাম।

কিন্তু অন্য তিনজনের কী হবে?

আমরা তিনজন ওষুধ নিয়ে ছুটলাম। ওদের ঘর জানা ছিল, দরজা ধাক্কা দিয়ে খুলিয়ে সকলকেই ওষুধ দিলাম। সকলেরই একই অবস্থা। পেট্রফ ভাল ইংরিজি জানে, আমাদের সঙ্গে ইংরিজিতেই কথা বলে, কিন্তু এখন সে রাশিয়ান ছাড়া কিছুই বলছে না—তাও আবার ব্যাকরণে ভুল। বার্তেল্লি তার ভাষায় কেবল 'মাম্মা মিয়া, মাম্মা মিয়া' অর্থাৎ 'মাগো, মাগো' বলছে, আর আমাদের ফরাসি বন্ধু কোনও কথাই বলছে না, কেবল ঘোলাটে দৃষ্টি নিয়ে ফ্যালফ্যাল করে সামনের দিকে চেয়ে আছে। যাই হোক, আমার আশ্চর্য ওষুধের গুণে সকলেই সুস্থ ও স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে এল।

প্রশ্ন হল—এখন কী কর্তব্য। ক্লাইন কি কোনও কারণে আমাদের পিছনে লেগেছে? কিন্তু কেন? আমায় বাধা দেওয়ায় তার আগ্রহ হবে কেন, আর সেইসঙ্গে অন্য সকলের উপরেও আক্রোশ কেন?

এ নিয়ে এখন ভেবে লাভ নেই। আমরা পরস্পরের কাছে বিদায় নিয়ে যে যার ঘরে ফিরে এলাম।



আর তার পরেই আমার মনের খটকার কারণটা বুঝতে পারলাম, আর সেইসঙ্গে বুঝলাম যে, আমার এভলিউটিন ওষুধ যথাশীঘ্র সম্ভব তৈরি করা দরকার।

কিন্তু ক্লাইনের সঙ্গে আমাদের যা সম্পর্ক, সে কি আমাদের কোনওরকম সাহায্য করবে? সেটা কাল সকালের আগে জানা যাবে না।

সেপ্টেম্বর ১৯

আজ সকালে ব্রেকফাস্টে নামতেই ক্লাইন জিজ্ঞেস করল, 'কাল তোমরা সুস্থ ছিলে? আমার শরীরটা কিন্তু খুব খারাপ হয়েছিল। মনে হয় কোনও খাবারে কোনও গোলমাল ছিল।'

আমরা অবিশ্যি সকলেই স্বীকার করলাম যে, আমাদেরও শরীরটা খারাপ হয়েছিল এবং ওষুধ খেয়ে তবে সুস্থ হয়েছি।

'কী ওষুধ খেলে?' জিজ্ঞেস করল ক্লাইন।

'প্রোফেসর শঙ্কুর তৈরি একটা ওষুধ', বলল সন্ডার্স।

'আহা, আমি জানলে তো আমিও খেতাম,' বলল ক্লাইন। 'আমাকে সারা রাত ছটফট করতে হয়েছে। আজ সকালে ছ'টার পরে অনুভব করলাম উদ্বেগটা কেটে গেছে।'

আমি বললাম, 'ভাল কথা, আজ যদি এলিক্সিরামটা পাই তা হলে খুব কাজ হয়।'

'বেশ তো, ব্রেকফাস্টের পরই দেব তোমায়।'

ব্রেকফাস্টের পর ক্রোল, সন্ডার্স আর পেট্রফ একটু বেড়াতে বেরোল। বার্তেল্লি আর রামো বলল যে, তারা আজ আদিম মানুষের কয়েকটা ছবি তুলবে। মানুষটা যখন ভয় কাটিয়ে উঠে কাছে আসতে শুরু করেছে, তখন ভাল ছবি উঠবে।

ক্লাইনের সঙ্গে আমি গেলাম ল্যাবরেটরিতে। ক্লাইন তাক থেকে একটা এলিক্সিরামের শিশি নামাতেই দেখলাম ওষুধ পালটানো হয়েছে। এর চেহারা এবং গন্ধ এলিক্সিরামের নয়। এলিক্সিরামে একটা খুব হালকা নীলের আভাস পাওয়া যায়; এটা একেবারে জলের মতো দেখতে। আমার চোখে ধুলো দেওয়া অত সহজ নয়।

তবে বাইরে আমি কিছু প্রকাশ করলাম না। একটা ঢাকনাওয়ালা পাত্রে তরল পদার্থটার এক চামচ নিয়ে ঢাকনা বন্ধ করে দিলাম।

ব্যর্থমনোরথ হওয়াতে মনটা খারাপ হয়ে গিয়েছিল, তাই নিজের ঘরে চলে এলাম। আজ আর আদিম প্রাণীটাকে দেখতে ইচ্ছা করছিল না। আমার গবেষণা সার্থক হতে হতে হল না। এর চেয়ে আপশোসের আর কী হতে পারে? অবিশ্যি শহরে খোঁজ করলে ড্রাগিস্টের দোকানে নিশ্চয়ই এলিক্সিরাম পাওয়া যাবে, কিন্তু সে ব্যাপারে যে ক্লাইন ব্যাগড়া দেবে না তার কী স্থিরতা?

সাড়ে দশটায় দরজায় টোকা পড়ল। খুলে দেখি সন্ডার্স আর ক্রোল।

'ড্রাগ নিয়েছ?' প্রশ্ন করল ক্রোল।

বললাম, 'নিয়েছি, কিন্তু সেটা আসল জিনিস নয়। ভেজাল।'

'সেটা আমি আন্দাজ করেছিলাম। এই নাও তোমার এলিক্সিরাম।'

ক্রোল পকেট থেকে একটা শিশি বার করে আমাকে দিল।

আমার ধড়ে প্রাণ এল। আমি তৎক্ষণাৎ আমার ওষুধের সঙ্গে এক চামচ এলিক্সিরাম মিশিয়ে দিলাম।

'কিন্তু এটা তুমি কার উপর প্রয়োগ করতে চাও?' জিজ্ঞেস করল সন্ডার্স।

আমি বললাম, 'যার উপর করলে একটা বিরাট রহস্য উদ্‌ঘাটিত হবে। কিন্তু এখন নয়। রাত্রে।'

ক্রোল আর সন্ডার্সের অনেক পীড়াপীড়ি সত্ত্বেও আমি কী করতে যাচ্ছি সেটা বললাম না।

দুপুরে লাঞ্চের সময় ক্লাইন বলে পাঠাল যে, তার শরীরটা আবার খারাপ হয়েছে, তাকে যেন আমরা ক্ষমা করি এবং তাকে ছাড়াই খেয়ে নিই।

বিকেলে আমরা সকলে হামবুর্গ শহর দেখতে বেরোলাম। সন্ধ্যা সাতটায় ফিরে এসে জানলাম যে, ক্লাইন সুস্থ, একটু বেরিয়েছেন এবং ডিনারের আগেই ফিরবেন।

আমার কেন জানি বুকের ভিতরটা কেঁপে উঠল। ক্লাইন বেরিয়েছে? সে একা, না তার সঙ্গে আর কেউ গেছে?

আমি বাকি পাঁচজনের দিকে চেয়ে বললাম, 'আমি একটা গোলমালের আশঙ্কা করছি। আমাদের একবার দেখা দরকার আদিম মানুষটা তার খাঁচায় আছে কি না। তোমরা এক মিনিট অপেক্ষা করো, আমি আমার অস্ত্রটা নিয়ে নিই, কারণ কী ঘটবে কিছুই বলা যায় না।'

আমার অ্যানাইহিলিন পিস্তলটা যে আমি সব সময় সঙ্গে নিয়ে সফরে যাই তা নয়, কিন্তু

এবার কেন জানি নিয়ে এসেছিলাম। বাক্স থেকে সেটা বার করে নিয়ে বাকি পাঁচজনকে নিয়ে ছুটলাম বাড়ির উত্তর দিকে লোহার শিকে ঘেরা অ্যাফারেনসিসের খাঁচার উদ্দেশে।

শিকের এক জায়গায় একটা লোহার গেট, সেখান দিয়েই ভিতরে ঢুকতে হয়। গেটের সামনে সশস্ত্র প্রহরী দাঁড়িয়ে রয়েছে—ক্লাইনের বিশ্বস্ত রুডলফ। আমাদের দেখে সে রিভলভার বার করল। কী আর করি—আমার অ্যানাইহিলিনের সাহায্যে তাকে অস্ত্রসমেত নিশ্চিহ্ন করে দিতে হল।

এখন পথ খোলা। আমরা ছয়জন ঢুকলাম খাঁচার মধ্যে। কিন্তু মিনিটখানেক এদিক ওদিক দেখেই বুঝলাম যে, আদিম মানুষ নেই। অর্থাৎ ক্লাইন তাকে নিয়েই বেরিয়েছে।

এবারে ক্রোল তার তৎপরতা দেখাল। সে বাড়ির ভিতরে গিয়ে সোজা পুলিশ স্টেশনে ফোন করল। ক্লাইনের ডেমলার গাড়ির নম্বরটা আমার মনে ছিল। সেটা ক্রোল পুলিশকে জানিয়ে দিয়ে বলল, এ গাড়ির জন্য এক্ষুনি যেন অনুসন্ধান করা হয়।

বিশ মিনিট লাগল পুলিশের কাছ থেকে উত্তর আসতে। কোনিগস্ট্রাসে আর গ্রুনবার্গস্ট্রাসের সঙ্গমস্থলে গাড়িটা ধরা পড়েছে, ক্লাইন রিভলভার দিয়ে একটি পুলিশকে জখমও করেছে। ক্লাইনের সঙ্গে একটি বুনো লোক রয়েছে, দু'জনকেই পুলিশ স্টেশনে নিয়ে আসা হয়েছে, আমরা যেন সেখানে যাই।

ফোন করে দুটো ট্যাক্সি আনিয়ে আমরা ক'জন পুলিশ স্টেশনে গিয়ে হাজির হলাম। ক্লাইনকে জেরা করা হচ্ছে, আমরা দেখতে চাইলাম বুনো মানুষটিকে। একটি কনস্টেবল আমাদের একটা ভিতরের ঘরে নিয়ে গেল। ঘরে আসবাব বলতে একটিমাত্র টেবিল আর একটি চেয়ার। মেঝের এক কোণে কুণ্ডলী পাকিয়ে আমাদের পরিচিত হোমো অ্যাফারেনসিস ঘুমোচ্ছে।

আমি আমার পকেট থেকে একটা বাক্স বার করে ঘুমন্ত মানুষটির দিকে এগিয়ে গেলাম। বাক্সে ইনজেকশনের সব সরঞ্জাম আর আমার এভলিউটিন ড্রাগ ছিল। ড্রাগটা সিরিঞ্জে ভরে ঘুমন্ত মানুষটির লোমশ হাতে একটা ইনজেকশন দিয়ে দিলাম।

তারপর গভীর উৎকণ্ঠায় আমরা ছয়জন বৈজ্ঞানিক ইনজেকশনের প্রতিক্রিয়ার জন্য অপেক্ষা করতে লাগলাম।

পাঁচ মিনিটের মধ্যেই রূপান্তর শুরু হল। গায়ের লোম মিলিয়ে এল, কপাল প্রশস্ত হল, চোয়াল বসে গেল, চোখ কোটর থেকে বেরিয়ে এল, শরীরের মাংসপেশী কমে এল।

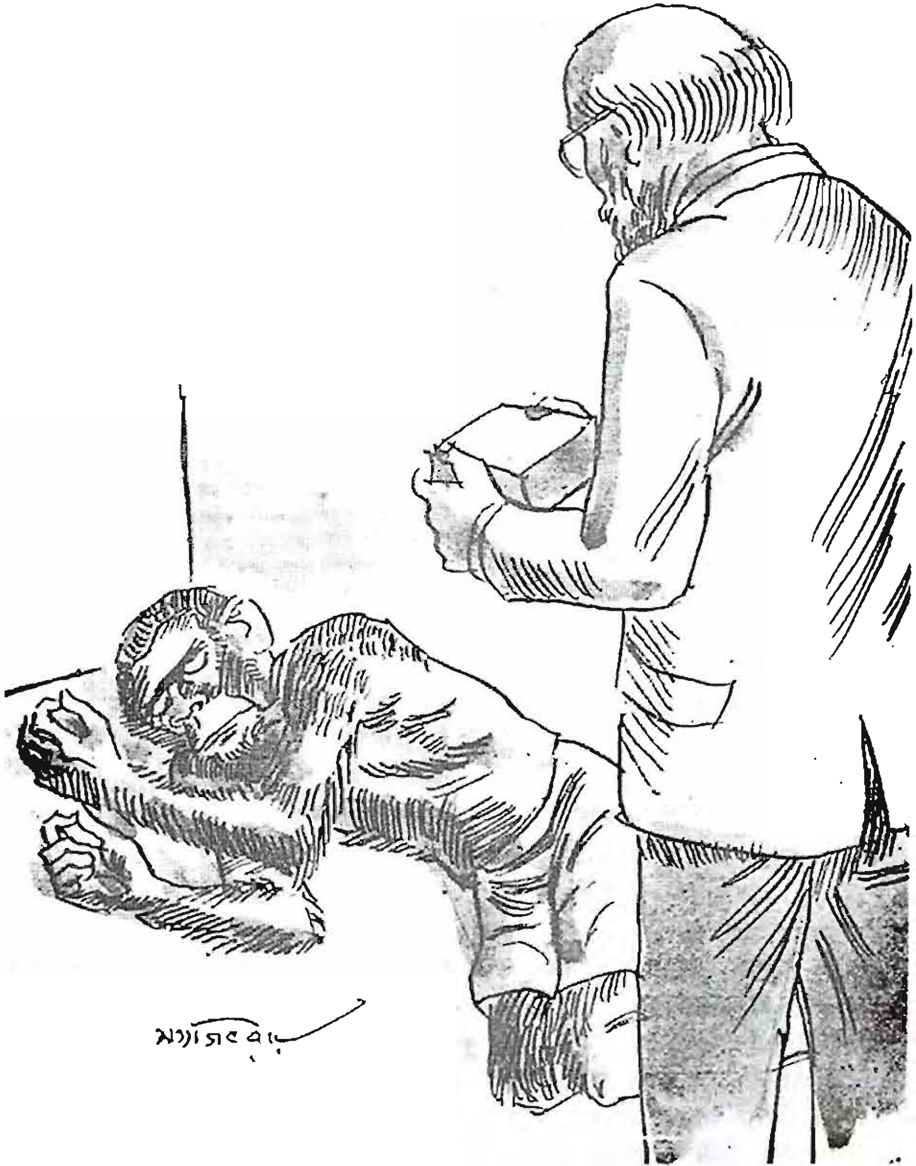
পনেরো মিনিটের মাথায় বোঝা গেল, আমরা যাকে দেখছি সে ব্রেজিলের কোনও উপজাতির অন্তর্গত নয়; সে ইউরোপের অধিবাসী, তার গায়ের রং আমার বন্ধুদেরই মতো। তার মাথার চুল সোনালি, তার শরীর দেখলে মনে হয় না তার বয়স ত্রিশের বেশি, তার নাক চোখে বোঝা যায় সে সুপুরুষ।

'মাইন গট!' বলে উঠল ক্রোল। 'এ যে হেরমান বুশ।'

আমি এবার আরেকটা ইনজেকশন দিয়ে বিবর্তন বন্ধ করে দিলাম। তারপর হাত দিয়ে ঠেলা দিতেই বুশ ধড়মড়িয়ে উঠে বসে চোখ কচলে জার্মান ভাষায় প্রশ্ন করল, 'তোমরা কে? আমি কোথায়?'

আমি বললাম, 'আমরা তোমার বন্ধু। তোমার যে শত্রু সে এখন পুলিশের জিম্মায়। এবার বলো তো ক্লাইন কী এক্সপেরিমেন্ট করছিল?'

'ওঃ!' বুশ কপাল চাপড়াল। 'হি ওয়াজ প্রিপেয়ারিং দ্য ড্রাগ অব সেটান।' অর্থাৎ সে শয়তানের দাওয়াই তৈরি করছিল। ওটা ইনজেক্ট করলে মানুষ বিবর্তনের পথে পিছিয়ে যেত। ক্লাইন সম্পূর্ণ মিথ্যা কথা বলে আমাকে ব্রেজিলে নিয়ে যায়; তারপর একদিন সুযোগ পেয়ে



আমাজন নদীতে আমাদের জাহাজের একটা ঘরে আমাকে রিভলভার দেখিয়ে জোর করে ইঞ্জেকশনটা দেয়। তারপর কী হয়েছে আমি জানি না।—কিন্তু তোমরা...তোমাদের তো অনেককেই চিনি দেখছি। ইউ আর প্রোফেসর শঙ্কু, তাই না?'

'তাই। এবার আমি তোমাকে একটা প্রশ্ন করতে চাই।'

'কী?'

'তুমি তো লেফ্‌ট হ্যান্ডেড—তাই না? আমার ডায়রিতে তুমি তো তোমার নামঠিকানা লিখে দিয়েছিলে। তখন থেকেই আমার মনে আছে।'

'ইয়েস—আই অ্যাম লেফ্‌ট হ্যান্ডেড।'

আমার খটকার কারণ ছিল এটাই। আশ্চর্য এই যে, আমরা দু'জন বৈজ্ঞানিক প্রায় একই গবেষণায় লিপ্ত ছিলাম, ও যাচ্ছিল পিছন দিকে, আমি যাচ্ছিলাম ভবিষ্যতের দিকে। এখন দেখছি যে, বিবর্তন নিয়ে বেশি কৌতূহল প্রকাশ না করাই ভাল। যা হচ্ছে তা আপনা থেকেই হোক। আমার এভলিউটিনের শিশি আমার গিরিডির তাকেই শোভা পাবে—ওটা আর ব্যবহার করার কোনও প্রশ্ন ওঠে না। তবে এটা স্বীকার করতেই হবে যে বর্তমান ক্ষেত্রে এটা কাজ দিয়েছে আশ্চর্যভাবে।

ক্লাইনের নিস্তার নেই, কারণ তার গুলিতে যে পুলিশটি জখম হয়েছিল, সে এইমাত্র মারা গেছে।



শঙ্কুর পরলোকচর্চা

সেপ্টেম্বর ১২

আজ বড় আনন্দের দিন। দেড় বছর অক্লান্ত পরিশ্রমের পর আজ আমাদের যন্ত্র তৈরির কাজ শেষ হল। 'আমাদের' বলছি এই কারণে যে, যদিও যন্ত্রের পরিকল্পনাটা আমার, এটা তৈরি করা আমার একার পক্ষে সম্ভব ছিল না। গিরিডিতে আমার ল্যাবরেটরিতেও এই যন্ত্র তৈরি করার উপযুক্ত মালমশলা নেই। এ ব্যাপারে আমি প্রথমেই চিঠি লিখি আমার জার্মান বন্ধু উইল্‌হেল্‌ম্ ক্রোলকে। জার্মানির ম্যুনিখ শহরে একটি বিখ্যাত পরলোকতত্ত্ব অনুশীলন সংস্থা বা সাইকিক রিসার্চ ইনস্টিটিউট আছে। ক্রোলেরই সুপারিশে এই সংস্থা থেকে আমরা অর্থসাহায্য পেয়েছি, এবং এই টাকাতেই দুই জার্মান ও এক ভারতীয় বৈজ্ঞানিক মিলে সম্ভব হয়েছে এই যন্ত্রটি তৈরি করা। দ্বিতীয় জার্মানটি হলেন এক যুবক—নাম রুডল্‌ফ হাইনে। প্রেততত্ত্ব সম্পর্কে এই যুবকেরও অপরিসীম উৎসাহ।

যন্ত্রটি সম্বন্ধে এবার কিছু বলি। এর নাম আমরা দিয়েছি কম্পিউডিয়াম। অর্থাৎ কম্পিউটারাইজ্‌ড মিডিয়াম। যারা প্ল্যানচেটের সাহায্যে পরলোকগত আত্মার সঙ্গে যোগ স্থাপন করে, তারা অনেক সময়ই একজন মিডিয়ামের সাহায্য নেয়। এই মিডিয়াম হলেন এমন একজন ব্যক্তি, যার মাধ্যমে প্রেতাত্মা সহজেই আবির্ভূত হয়। মিডিয়ামের এই হল বিশেষ গুণ। আমি দেশে অনেক মিডিয়ামের সংস্পর্শে এসেছি, এবং এদের স্টাডি করেছি। এদের স্বভাব হয় একটু বিশেষ ধরনের। অনুভূতি রীতিমতো সূক্ষ্ম, আর তার সঙ্গে একটু ভাবুক, তদ্গত ভাব। স্বাস্থ্য অনেকেরই দুর্বল, আয়ুও অনেক ক্ষেত্রেই কম। আমাদের যন্ত্রটা তৈরি করার আগে ইউরোপে ক্রোল আর ভারতবর্ষে আমি অন্তত সাড়ে তিনশো মিডিয়ামকে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পরীক্ষা করে দেখি। আমাদের উদ্দেশ্যই ছিল আত্মার সঙ্গে যোগস্থাপনের কাজে জ্যান্ত মিডিয়ামের জায়গায় যান্ত্রিক মিডিয়াম ব্যবহার করা। এই কাজে ম্যুনিখের সাইকিক রিসার্চ ইনস্টিটিউট আমাদের প্রস্তাবে পৃষ্ঠপোষকতা করতে এককথায় রাজি হয়ে যায়। টাকাও তারা ঢেলেছে অঢেল। এরমধ্যেই কম্পিউডিয়ামের ক্ষমতার যা পরিচয় পেয়েছি তাতে আমাদের তিনজনের পরিশ্রম আর ইনস্টিটিউটের অর্থব্যয় সার্থক হয়েছে বলে মনে হয়।

যন্তরটা দেখতে মানুষের মতো হবার কোনও প্রয়োজন ছিল না, কিন্তু আমরা ইচ্ছা করেই এটার একটা ধড় এবং মুণ্ডু দিয়ে দিয়েছি। সেইসঙ্গে দাঁড় করাবার জন্য পায়েরও ব্যবস্থা হয়েছে। যন্ত্রটা ঠিক এক মিটার উঁচু। মাথার উপর একটা চেরা ফাঁক রয়েছে, সেখান দিয়ে আমরা যে আত্মার সঙ্গে যোগস্থাপন করতে চাইছি তার সম্বন্ধে তথ্য একটা কার্ডে লিখে পুরে দেওয়া হয়। যন্ত্রটাকে ঘরের এক পাশে বসিয়ে রেখে যারা এই প্ল্যানচেটে অংশ নিচ্ছে, তাদের বসানো হবে হাতদশেক দূরে এটার মুখোমুখি। যন্ত্রে কার্ড পোরা হলে পর ঘরের বাতি নিবিয়ে দেওয়া হয়। এই সম্পূর্ণ অন্ধকার ঘরে ক্রমে যন্ত্রের বুকে বসানো একটা লাল বাতি জ্বলে ওঠে। তার মানে আত্মা উপস্থিত। এইবার আমরা আত্মাকে প্রশ্ন করতে থাকি, আর তার উত্তর যন্ত্রের মুখ দিয়ে বেরোতে থাকে। আত্মা ক্লান্ত হলে পর লাল বাতিটা ধীরে ধীরে নিবে যায়, আর প্ল্যানচেটও শেষ হয়ে যায়।

আমরা তিন বৈজ্ঞানিক মিলে যন্ত্রটাকে এরমধ্যেই পরীক্ষা করে দেখেছি। অ্যাডল্‌ফ হিটলারের

আত্মাকে আনানো হয়েছিল। তথ্য যন্ত্রে পুরে দেওয়ার এক মিনিটের মধ্যেই লাল বাতি জ্বলে ওঠে। আমি জার্মান ভাষায় প্রশ্ন করি, 'তুমি কি অ্যাডলফ হিটলার?' উত্তর আসে 'ইয়া', অর্থাৎ হ্যাঁ। ক্রোল দ্বিতীয় প্রশ্ন করে, 'তুমি ইহুদিদের এমন নৃশংসভাবে নির্যাতন করেছ তোমার জীবদ্দশায়, তার জন্য এখন তোমার অনুশোচনা হয় না?' তৎক্ষণাৎ যন্ত্রের মুখ থেকে তীক্ষ্ণস্বরে উত্তর বেরোয়—'নাইন! নাইন! নাইন!'—অর্থাৎ না, না, না। প্রায় পাঁচ মিনিট চলেছিল এই আত্মার সঙ্গে সাক্ষাৎকার; এটা বেশ বুঝেছিলাম যে, হিটলার বেঁচে থাকতে সে নিজের সম্বন্ধে যে ধারণা পোষণ করত, মৃত্যুর এতদিন পরেও তার কোনও পরিবর্তন হয়নি।

দু'দিন বিশ্রাম নিয়ে আবার যন্ত্রটাকে নিয়ে কাজ শুরু করব। হাইনের আকাঙ্ক্ষা একেবারে আকাশচুম্বী। সে মনে করে যে, যন্ত্রের আরেকটু সংস্কার করলে আমরা আত্মার চেহারা দেখতে পাব। অর্থাৎ মৃত ব্যক্তি সশরীরে আমাদের সামনে এসে দাঁড়াবে।

সেটা হলে মন্দ হয় না, কিন্তু এখনও যন্ত্রটা যে অবস্থায় রয়েছে এবং যে কাজ করছে, সেটাকেও বিজ্ঞানের একটা অক্ষয় কীর্তি বললে বাড়িয়ে বলা হবে না।

এবার একদিন কিছু বাছাই করা বৈজ্ঞানিকদের ডেকে আমাদের যন্ত্রের একটা ডিমনস্ট্রেশন দিতে হবে। এখনও পর্যন্ত ব্যাপারটা ধামাচাপা রয়েছে।

আমি ক্রোলের অনুরোধে আরও একমাস ম্যুনিখে থাকব।

সেপ্টেম্বর ১৫

আমাদের যন্ত্রের সাহায্যে দু'জন বিখ্যাত ব্যক্তির আত্মার সঙ্গে যোগস্থাপন করেছি। একটি ভারতীয়—নবাব সিরাজ-উদ্-দৌলা। এটা আমার একটা ব্যক্তিগত কৌতূহল মেটানোর জন্য। সিরাজকে জিজ্ঞেস করলাম অন্ধকূপ হত্যার কথা। সিরাজ হেসে বলল, সে এ সম্বন্ধে কিছুই জানত না। ব্রিটিশরা তাকে হেয় করার জন্য এই জঘন্য অপবাদ রটিয়েছিল। আত্মা মিথ্যা বলে না, তাই কলঙ্কমোচনটা বেশ ভালভাবেই হল।

দ্বিতীয় আত্মাটি ছিল শেক্সপিয়রের। এখানে আমার প্রশ্ন ছিল, 'তোমার সম্বন্ধে কেউ কেউ বলেন যে, তুমি যা লেখাপড়া শিখেছিলে এবং যে সাধারণ পরিবারে তোমার জন্ম, তাতে করে মনে হয় না যে, তোমার নাটক আর কাব্য তুমি নিজেই লিখেছ। অনেকের ধারণা লেখক আসলে হলেন ফ্রান্সিস বেকন। এ বিষয়ে তুমি কী বলো?'

শেক্সপিয়রের আত্মা প্রশ্ন শুনে প্রথমে অট্টহাস্য করে ওঠে। তারপর মানুষের অপজ্ঞান সম্বন্ধে একটা চমৎকার চার লাইনের পদ্য শুনিয়ে প্রশ্ন করল, 'আমার ভাষায় বেকন মানে কী জান?' আমি বললাম, 'কী?' উত্তর এল, 'বেকন মানে গেঁয়ো ভূত। তোমাদের অভিধান খুলে দেখো—এই মানে দেওয়া আছে। এই গেঁয়ো ভূত রচনা করবে আমার নাটক? তোমাদের যুগের মানুষের কি মতিভ্রম হয়েছে?'

এই দুটি আত্মা নামানোর সময়ও কেবল আমরা তিনজনই উপস্থিত ছিলাম। গতকাল সন্ধ্যায় এখানকার এগারো জন বৈজ্ঞানিককে ডেকে আমাদের যন্ত্রের একটা ডিমনস্ট্রেশন দেওয়া হল। ক্রোল আমাকে আগে থেকেই সাবধান করে দিয়েছিল যে, এঁদের মধ্যে দু'একজন আছেন যাঁরা প্ল্যানচেটে আদৌ বিশ্বাস করেন না। বিশেষ করে প্রোফেসর শুল্ৎস। লোক হিসেবেও নাকি ইনি বিশেষ সুবিধের নন, যদিও একটি পদার্থবিজ্ঞান সংস্থার শীর্ষে বসে আছেন। তিন বছর আগে এই সংস্থার ডিরেক্টর প্রোফেসর হুবারমানের অকস্মাৎ মৃত্যুতে শুল্ৎস এই পদটি পান।

আমি বললাম, 'কিছু সন্দেহবাতিকগ্রস্ত লোক থাকবেই, যাদের মনে বিশ্বাস উৎপাদন করা কঠিন হবে। কিন্তু তাতে কিছু এসে যায় না। শুল্ৎস যা-ই বলুন না কেন, আমরা আমাদের ডিমনস্ট্রেশন



চালিয়ে যাব।'

হাইনে বলল, 'এঁদের মনে বিশ্বাস উৎপাদন করার সবচেয়ে ভাল উপায় হবে হুবারমানের আত্মাকে আহ্বান করা। তাঁর কথা বলার ভঙ্গি এঁদের সকলেরই জানা আছে। আমাদের যন্ত্র যদি সেইভাবে কথা বলে, তাহলে এঁদের মনে সহজেই বিশ্বাস আসবে।'

আমি আর ক্রোল এ প্রস্তাবে সায় দিলাম।

সাইকিক ইনস্টিটিউটের একটি হলঘরেই সব ব্যবস্থা হল। সন্ধ্যা সাতটায় সময় দেওয়া হয়েছিল, সকলেই ঘড়ির কাঁটায় এসে হাজির।'

সামনের সারিতে একটি চেয়ার দখল করে বসবার আগেই শুলৎস বলল, 'আমি আগে একবার যন্ত্রটাকে দেখতে চাই।'

ক্রোল বলল, 'স্বচ্ছন্দে।'

শুল্ৎস প্রায় পাঁচ মিনিট ধরে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে যন্ত্রটাকে দেখল। তারপর নিজের জায়গায় ফিরে এসে বসে বলল, 'ঠিক আছে; এবার শুরু হোক তোমাদের তামাশা।'

এবার ক্রোল ঘোষণা করল যে, প্রথমে প্রোফেসর হুবারমানের আত্মার সঙ্গে যোগস্থাপন করা হবে। আমি ভেবেছিলাম, শুল্ৎস হয়তো আপত্তি করবে, কিন্তু সে কিছুই বলল না। অন্য সকলে অবশ্যই রাজি।

যন্ত্রের মধ্যে তথ্য পুরে দিয়ে ক্রোল ঘরের বাতি নিভিয়ে সন্তর্পণে এসে আমার পাশে নিজের চেয়ারে বসল।

সবাই তটস্থ, ঘরে চোদ্দোজন বৈজ্ঞানিকের নিশ্বাস ফেলার শব্দ পর্যন্ত শোনা যাচ্ছে না।

দু' মিনিটের মাথায় ধীরে ধীরে লাল বাতিটা জ্বলে উঠল। বাতিটা থেকে খানিকটা প্রতিফলিত আলো ঘরের মানুষদের উপরেও এসে পড়েছিল, তাই আবছা আবছা সকলকেই চেনা যাচ্ছিল। অবিশ্যি যন্ত্রের পিছন দিকটায় দুর্ভেদ্য অন্ধকার।

'আপনি কি প্রোফেসর হুবারমান?' প্রশ্ন করল ক্রোল।

উত্তর এল, 'হ্যাঁ, কিন্তু আমাকে ডাকা হয়েছে কেন? এই মিথ্যার জগৎ আমার কাছে একেবারে মূল্যহীন।'

'একথা কেন বলছেন?' ক্রোল প্রশ্ন করল।

উত্তর এল, 'যে জগতে নৃশংস হত্যাকারীও আইনের হাত থেকে নিস্তার পেয়ে যায়, তার কী মূল্য থাকতে পারে?'

আমি অন্যদের দিকে চেয়ে দেখলাম, তাদের মধ্যে একটা চাঞ্চল্যের ভাব। শুল্‌ৎস চেঁচিয়ে উঠল, 'এসব বুজরুকির অর্থ কী? ক্রোল, আমার বিশ্বাস, তুমি হুবারমানের হয়ে কথা বলছ। তুমি তো ভেন্ট্রিলোকুইজ্‌ম জান!'

ক্রোল যে ভেন্ট্রিলোকুইজ্‌ম জানে, সেটা আমিও জানতাম, কিন্তু এ গলা যে আমাদের যন্ত্র থেকেই আসছে, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। ক্রোলের মুখ বন্ধ; সে অবস্থায় শব্দ উচ্চারণ করা মোটেই সম্ভব নয়।

এদিকে যন্ত্রের মধ্যে থেকে আবার কথা শুরু হয়ে গেছে।

'আমি ছিলাম পদার্থবিজ্ঞান সংস্থার ডিরেক্টর। আমার পদটি দখল করার জন্য আমার কফির সঙ্গে পটাশিয়াম সায়ানাইড মিশিয়ে আমাকে খুন করেন ইয়োহান শুল্‌ৎস। কিন্তু শুধু প্রমাণের অভাবে তিনি পার পেয়ে যান। এর চেয়ে বড় অন্যায় আর কিছু থাকতে পারে না। আমি...'

হঠাৎ একটা কাচ ভাঙার শব্দের সঙ্গে সঙ্গে লাল বাতি উধাও হয়ে গেল। আমার দৃষ্টি প্রোফেসর শুল্‌ৎসের উপর ছিল, তাই আমি দেখলাম যে, সে পকেট থেকে তার পাইপটা বার করে যন্ত্রের দিকে ছুড়ছে, আর অব্যর্থ লক্ষ্যে বাল্‌বটা ভেঙে চুরমার হয়ে গেছে।

সেইসঙ্গে অবিশ্যি আত্মার কথাও বন্ধ হয়ে গেল।

ক্রোল উঠে গিয়ে ঘরের বাতি জ্বালিয়ে দিল।

আমাদের সকলেরই দৃষ্টি শুল্‌ৎসের দিকে। কিন্তু শুল্‌ৎসের স্নায়ু যে অত্যন্ত মজবুত, তাতে কোনও সন্দেহ নেই। সে শুধু ইস্পাতশীতল কণ্ঠে ক্রোলকে উদ্দেশ করে বলল, 'আজকের এই ঘটনার ফলে আমি কিন্তু তোমার বিরুদ্ধে মানহানির অভিযোগ আনতে পারি। যন্ত্রের দোহাই দিয়ে তুমি আমাকে হত্যাকারী বলে প্রতিপন্ন করতে চাইছ? তোমার আস্পর্ধা তো কম না!'

এই কথা বলে শুল্‌ৎস তার পাইপটা না নিয়েই গটগট করে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

বাকি দশজনের মধ্যে একজন—পদার্থবিদ প্রোফেসর এরলিখ—শুধু একটি মন্তব্য করলেন তাঁর গম্ভীর গলায়।

'আমাদের অনেকেরই মনের সন্দেহ আজ সত্যি বলে প্রমাণ করেছেন হুবারমানের আত্মা। এই যন্ত্রের কোনও তুলনা নেই।'

সেপ্টেম্বর ১৮

এই একদিনের ঘটনার ফলেই আমাদের কম্পিউডিয়ামের খ্যাতি বহুদূর ছড়িয়ে পড়েছে। আমাদের আরেকটা ডিমনস্ট্রেশনের ব্যবস্থা করতে হবে। ইতিমধ্যে বাল্‌বটা আমরা নতুন করে লাগিয়ে নিয়েছি। আমাদের তরুণ বন্ধু হাইনে যন্ত্রটার পিছনে অনেকটা করে সময় দিচ্ছে, যাতে ওর আরও কিছু ক্ষমতা আরোপ করা যায়। আগামী শনিবার ২২ সেপ্টেম্বর প্রায় পঞ্চাশজন গণ্যমান্য



ব্যক্তিকে বলা হয়েছে কম্পিউডিয়ামের একটা ডিমনস্ট্রেশনের জন্য। ইনস্টিটিউটেই হবে ব্যাপারটা। নিমন্ত্রিতদের মধ্যে বিজ্ঞানী, সাহিত্যিক, ডাক্তার, সংগীতশিল্পী, চিত্রকর, ব্যবসাদার, সাংবাদিক—সব রকমই লোক আছে। দেখা যাক কী হয়।

সেপ্টেম্বর ২৩

কাল হইহই কাণ্ড। কিন্তু সাংবাদিকদের নিয়ে কী করা যায় সেটা ভেবে পাচ্ছি না। এত প্রমাণের পরেও তারা বলছে, ব্যাপারটাতে বুজরুকি আছে। অন্ধকারের মধ্যে আমরা নাকি নিজেরাই যা করার করে যন্ত্রের উপর দায়িত্ব চাপাচ্ছি। 'তিন বৈজ্ঞানিকের কারচুপি', 'বিজ্ঞানের মুখে কালি' ইত্যাদি হেডলাইন কাগজে বেরিয়েছে। হাইনে বারবার বলছে, 'আত্মাকে চোখের সামনে উপস্থিত করতে পারলে তবেই এরা ব্যাপারটা বিশ্বাস করবে।' আমরা ওকে এক মাস সময় দিয়েছি যন্ত্রটার উপর কাজ চালাতে। তাতে ও যদি সফল হয় তাহলে তো কথাই নেই।

এবার ২২ তারিখের বৈঠকে কী হল সেটা বলি।

তবে তারও আগে একটা কথা বলা দরকার।

আমি কিছুদিন থেকেই ভাবছিলাম যে, ঐতিহাসিক যুগে সভ্য জগৎ থেকে আত্মা নামানো তো হল; এবার আরেকটু পিছনে গেলে কেমন হয়। সম্প্রতি এখানকার খবরের কাগজে একটা প্রবন্ধ বেরিয়েছে, সেইটে পড়েই এই চিন্তাটা প্রথম মাথায় আসে। বাউমগার্টেন বলে একজন ইতিহাসের অধ্যাপক প্রস্তরযুগের মানুষ সম্বন্ধে বলতে গিয়ে লিখেছেন যে, স্পেন ও ফ্রান্সের কিছু গুহায় যেসব জানোয়ারের আশ্চর্য রঙিন ছবি রয়েছে—তেমন আঁকা আজকের দিনের শিল্পীর পক্ষেও প্রায় অসম্ভব—সেগুলো প্রস্তরযুগের মানুষের কীর্তি হতেই পারে না। লেখাটা পড়ে আমার মনে পড়ল যে, গুহাগুলো যখন আবিষ্কার হয়েছিল, তখনও সভ্য সমাজের অনেকেই এই একই কথা বলে যে,

ছবিগুলো আসলে আজকের দিনের কোনও শিল্পীর আঁকা, সেগুলোকে বিশ হাজার বছরের পুরনো বলে চালানো হচ্ছে।

আমি ঠিক করলাম, এবার কম্পিউডিয়ামের সাহায্যে সেই প্রস্তরযুগের একজন মানুষের আত্মাকে আনাব। তার সঙ্গে অবিশ্যি কথা বলা চলবে না। কারণ সম্ভবত অতদিন আগে কোনও ভাষার উদ্ভব হয়নি। কিন্তু এই আত্মা কী রকম আচরণ করে, মুখ দিয়ে কোনও শব্দ করে কি না, সেগুলোও তো জানবার জিনিস। হয়তো সে একটা অজানা কোনও ভাষায় কথা বলতে আরম্ভ করবে। সেটা অবশ্যই একটা অতি মূল্যবান আবিষ্কার হবে।

ক্রোল শুনে আমার প্রস্তাবে সায় দিয়ে বলল, 'তাহলে প্রবন্ধের লেখক বাউমগার্টেনকেও ডাকা যাক—সেও উপস্থিত থাকুক।'

আমি বললাম, 'উত্তম প্রস্তাব।'

বাউমগার্টেনের সঙ্গে যোগাযোগ করে দেখলাম, সে যে শুধু প্রস্তরযুগের প্রাচীর-চিত্রকেই উড়িয়ে দেয় তা নয়, পরলোকচর্চা সম্পর্কেও তার প্রচণ্ড অবিশ্বাস। দস্তুরমতো সাধাসাধি করে তবে তাকে শেষপর্যন্ত রাজি করানো গেল।

বাইশে সন্ধ্যা সাতটায় সকলে হাজির হল ইনস্টিটিউটের মাঝারি হলটায়। একটা জানলাহীন বড় দেয়ালের সামনে কিছু দূরে যন্ত্রটাকে রাখা হল, আমরা এবং আমন্ত্রিত সকলে অর্ধচন্দ্রাকৃতি আকারে তার সামনে পনেরো হাত দূরে চেয়ার পেতে বসলাম। সভা শুরু হবার আগে আমি উঠে দাঁড়িয়ে ঘোষণা করলাম যে, আজ আমরা প্রস্তরযুগের একজন মানুষের আত্মাকে আহ্বান করছি। যদি দেখি, তাতে কোনও ফল হল না, তাহলে ঐতিহাসিক যুগের কাউকে ডাকব।

এবার আমি যন্ত্রের মাথায় তথ্যের কার্ড গুঁজে দিয়ে বোতাম টিপে দিলাম। বলা বাহুল্য, যন্ত্রটা বৈদ্যুতিক শক্তিতে কাজ করে।

এরপর ঘর অন্ধকার হয়ে গেল। আমরা স্তব্ধ হয়ে বসে কী ঘটে দেখার জন্য অপেক্ষা করতে লাগলাম।

তিন মিনিট পেরিয়ে গেল, বাতি আর জ্বলে না। তা হলে কি...?

না—ওই যে ক্ষীণ আলো দেখা দিয়েছে।

ক্রমে লাল বাতি উজ্জ্বলতর হল। তারপর একটা সময় এসে স্থির হয়ে গেল।

কোনও শব্দ নেই। কিন্তু ঘরে একটা বুনো গন্ধ পাচ্ছি। এটা বোধ হয় হাইনের কারসাজি, কারণ গন্ধ এতদিন পাইনি।

মিনিটখানেক অপেক্ষা করে আমি স্পেনীয় ভাষায় জিজ্ঞেস করলাম, 'এ ঘরে কোনও আত্মা এসেছে কি?'

উত্তরের বদলে একটা যেন ঘড়ঘড়ে জান্তব শব্দ হল। তারপর আরও কয়েকটা শব্দ হল, যার কোনও মানে আমাদের জানা নেই।

বুঝলাম, এই আত্মার সঙ্গে কথা বলে কোনও লাভ নেই।

কিন্তু তা হলে কী করা হবে? লাল আলো দেখে বুঝতে পারছি, আত্মা এখনও উপস্থিত।

প্রায় মিনিটদশেক এইভাবে জ্বলে আলোটা ক্রমে মিলিয়ে গেল।

আর তার পরেই ঘরের বাতি জ্বলতে এক অত্যাশ্চর্য দৃশ্য দেখে আমাদের সকলের মুখ থেকেই নানারকম বিস্ময়সূচক শব্দ বেরিয়ে পড়ল।

যন্ত্রের পিছনের সাদা দেয়ালে একটা শিং বাগিয়ে তেড়ে আসা বাইসনের প্রকাণ্ড রঙিন ছবি আঁকা রয়েছে। এ ছবি যদি পিকাসোও আঁকতেন, তা হলেও তিনি গর্বই বোধ করতেন।

এই ছবি আমাদের জন্য এঁকে গেছেন বিশ হাজার বছর আগের প্রস্তরযুগের অজ্ঞাত মানুষের আত্মা।



সেপ্টেম্বর ২৮

সেদিনের আশ্চর্য ঘটনা সম্পর্কে আমাদের একজন দর্শক—পুরাতত্ত্ববিদ প্রোফেসর ওয়াইগেল—যন্ত্রটার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে সংবাদপত্রে একটা সাক্ষাৎকার দিয়েছিলেন। কিন্তু সেইসঙ্গে বাউমগার্টেন আবার আমাদের বুজরুক বলে ঘোষণা করেছেন অন্য আর একটা কাগজে। আমাদের তিনজনের মধ্যে নাকি একজন শিল্পী, আর তিনিই নাকি অন্ধকারের সুযোগ নিয়ে দেয়ালে ছবি এঁকে এসেছিলেন। এর ফলে গত তিনদিন ধরে কাগজে তুমুল তর্কবিতর্ক চলছে। বেশিরভাগ কাগজই আমাদের বিরুদ্ধে। আমি সাংবাদিক জাতটার প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে সব ছেড়েছুড়ে দেশে ফেরার কথা ভাবছি। এমন সময় আজ সকালে হঠাৎ হাইনে এসে সোল্লাসে ঘোষণা করল যে, তার পরিশ্রম সার্থক হয়েছে, যন্ত্রের পাশে আত্মা সশরীরে আবির্ভূত হচ্ছে। আমি তো অবাক। ক্রোলকে বলতে সে বলল, 'অবিলম্বে পরীক্ষা করে দেখা যাক। তুমি নিজে কি পরীক্ষা করেছ?'

'না করে আর বলছি!' বলল হাইনে। 'আমি আমারই নামধারী অষ্টাদশ শতাব্দীর কবি হাইনরিখ হাইনের সঙ্গে এইমাত্র কথা বলে আসছি। তিনি কী পোশাক পরেছিলেন, তারও বর্ণনা আমি দিতে পারি।'

আমরা তিনজনে তখনই যন্ত্রটাকে নিয়ে বসে গেলাম। দশ মিনিটের মধ্যে দেখি বিশ্ববিখ্যাত জার্মান সুরকার বেটোফেন কালো কোট পরে আমাদের সামনে অস্থিরভাবে পায়চারি করছেন। আমরা তাঁকে কিছু প্রশ্ন করার আগেই বেটোফেন গভীর আক্ষেপের সঙ্গে চেঁচিয়ে উঠলেন, 'উঃ—



আমার এই বধিরতাই হবে আমার কাল! হে ভগবান, আমারই কানদুটোকে শেষটায় তুমি নিষ্ক্রিয় করে দিলে!'

মনে পড়ে গেল, বেটোফেন মাঝবয়স থেকেই কালা হয়ে গিয়েছিলেন।

হাইনের এই কীর্তিতে আমরা বাকি দুজনও খুব গর্ব বোধ করছি। আমার মন বলছে, এবার হয়তো সাংবাদিকদের স্থূল মস্তিষ্কে প্রবেশ করানো যাবে আমাদের এই যন্ত্রের অনন্যতা।

আমরা তিনজনেই স্থির করলাম যে, ইনস্টিটিউটের সাহায্যে জার্মানির যত নামকরা সাংবাদিক আছে—বিশেষ করে যারা আমাদের নিন্দা করেছে—তাদের সকলকে আরেকটা বৈঠকে ডাকব। এবার ইনস্টিটিউটের বড় লেকচার-হলটাকে নেওয়া হবে এবং মঞ্চের মাঝখানে বসবে আমাদের যন্ত্র।

আমরা সেই মর্মে আমন্ত্রণ পাঠিয়ে দিয়েছি। অবিশ্যি এবারও আমরা বৈজ্ঞানিকদের বাদ দিইনি। শুল্‌ৎসকেও বলা হয়েছে। সে কার্ড পেয়ে আমাকে ফোন করেছিল। বলল, 'এবার কী নতুন বুজরুকি দেখাবে তোমরা?'

আমি বললাম, 'সেটা আপনি সশরীরে বর্তমান থেকে দেখুন না। এইটুকু বলতে পারি যে, এবার শুধু শোনার নয়, দেখার জিনিসও থাকবে।'

শুল্‌ৎস হেসে বলল, 'তা ম্যাজিক দেখতে আর কে না ভালবাসে! আর সে ম্যাজিক যদি সর্বসমক্ষে ফাঁস করে দেওয়া যায়, তার থেকে বেশি মজা আর কিছুতেই নেই।'

আমি বললাম, 'আপনার মতলব তাই হলেও আপনি দয়া করে আসুন।'

'দেখি', বলল শুল্‌ৎস।

আমার মন বলছে, শুল্‌ৎস না এসে পারবে না।

সবসুদ্ধ সাড়ে সাতশো লোককে বলা হয়েছে। ইনস্টিটিউটের হলে ধরে আটশো।

৩ অক্টোবর আমাদের বৈঠক।

অক্টোবর ৩, রাত সাড়ে বারোটা

আজ সন্ধ্যার ঘটনা ভাবতে এখনও শিউরে শিউরে উঠছি। তবে আমাদের যে জয় হয়েছে, তাতে কোনও সন্দেহ নেই। বৈঠকের শেষে শিহরন সত্ত্বেও হলের কোনও লোক হাততালি দিতে ছাড়েনি। আমাদের তৈরি এই কম্পিউডিয়াম আমাদের মান রেখেছে আশ্চর্যভাবে।

আমন্ত্রিতদের প্রত্যেকেই এসেছিল। বিনাপয়সায় তামাশা দেখার লোভ কে সামলাতে পারে? শেষপর্যন্ত টেলিফোনে বহু অনুরোধের ফলে লেকচার-হল ভরেই গেল।

আজ সভা আরম্ভ হবার আগে একটা ছোট বক্তৃতায় ক্রোল জানিয়ে দিল আমাদের মনোভাবটা। বিজ্ঞানের কোনও যুগান্তকারী আবিষ্কারই প্রথমে সকলে মেনে নেয়নি। টেলিফোন, টেলিগ্রাফ, টেলিভিশন থেকে শুরু করে আণবিক বিস্ফোরণ, চাঁদে অবতরণ, মহাকাশে স্যাটিলাইট প্রেরণ, এই সবকিছু সম্বন্ধেই বহু লোকে মনে সন্দেহ পোষণ করেছে। আমাদের ক্ষেত্রেও তাই হবে, এবং আজকে যা ঘটতে চলেছে, তা এই যন্ত্র সম্পর্কে মানুষের মনে বিশ্বাস জাগাবে, এটাই আমাদের ধারণা।

আজ কথা ছিল যে, যন্ত্রটার মাথায় তথ্য পুরবে হাইনে, এবং সে যে কার প্রেতাত্মাকে নামাতে চায়, সেটা আমাদের দু'জনকেও বলবে না। এটা হবে একটা সারপ্রাইজ। ক্রোল আমি তাতে রাজি হয়ে যাই, কারণ, হাইনের বয়স কম হলেও সে অতি বিচক্ষণ বৈজ্ঞানিক। তা ছাড়া, তার তরুণ মস্তিষ্কে যে ধরনের বুদ্ধি খেলে, সেটা বর্তমান পরিস্থিতিতে কাজে লাগতে পারে।

ক্রোল বক্তৃতা দিয়ে বসার পর হাইনে উঠে দাঁড়িয়ে সভার সকলকে অভিবাদন জানিয়ে বলল, 'আজ আমরা আপনাদের জানিয়েছি যে, আমাদের কম্পিউডিয়ামের সাহায্যে একটি প্রেতাত্মা উপস্থিত করা হবে। আমি শুধু এইটুকু বলতে চাই যে, সেটা কীসের আত্মা সেটা আগে থেকে বলা হবে না। আত্মা এলে পর আপনারা নিজের চোখেই দেখতে পাবেন।'

হাইনে তার কথা শেষ করে পকেট থেকে একটা কার্ড বার করে মঞ্চের মাঝখানে রাখা যন্ত্রটার মাথায় গুঁজে দিল। তারপর একজন কর্মচারীর দিকে ইঙ্গিত করাতে সে হলের সব বাতি নিবিয়ে দিল।

আমি সহজে নার্ভাস বা বিচলিত হই না। কিন্তু আজ কেন জানি আমি বুকের ভিতর একটা দুরুদুরু অনুভব করছিলাম। কার আত্মা আসছে হাইনের আহ্বানে?

পাঁচ মিনিট কোনও ঘটনা নেই। ঘরে মিশকালো অন্ধকার। জানালাগুলো কালো পর্দা দিয়ে ঢাকা। কে যেন একজন কাশতে গিয়ে কাশি চেপে নিল। তারপরেই আবার নিস্তব্ধতা। বুঝতে পারছি, সকলে দম বন্ধ করে অপেক্ষা করছে।

আমার দৃষ্টি মঞ্চের মাঝখান থেকে এক চুলও নড়ছে না।

ওই যে—একটা যেন লাল বিন্দু দেখতে পাচ্ছি।

হ্যাঁ, কোনও ভুল নেই। যন্ত্রের বুকে লাল আলো জ্বলে উঠেছে। তার মানে...

হঠাৎ একটা শব্দ পেলাম নিস্তব্ধ ঘরের মধ্যে।

ঝড়ের শব্দ।

না, ঝড় নয়; উড়ন্ত পাখির ডানার শব্দ।

ওই যে পাখি। পাখি কি? হলের এ মাথা থেকে ও মাথা উড়ে বেড়াচ্ছে ওটা কী?

এবার বুঝতে পারলাম—কারণ প্রাণীটার গা থেকে ফসফরাসের আলো বিচ্ছুরিত হচ্ছে। বাদুড় পাখি আর সরীসৃপ মেশানো একটা প্রাণী, মঞ্চের মাঝখান থেকে উঠে চক্রাকারে ঘুরতে লেগেছে সমস্ত হল জুড়ে, দর্শকদের মাথার উপর দিয়ে। সেইসঙ্গে মাঝে মাঝে তার দাঁতালো মুখটা হাঁ করে চিৎকার করে উঠছে।

টেরোড্যাকটিল!

দাঁত ও ডানা বিশিষ্ট ভীষণ হিংস্র প্রাণী—আজ থেকে দেড় কোটি বছর আগে ছিল পৃথিবীতে। হাইনে সেই প্রাণীর বর্ণনা দিয়েছে তার কার্ডে। প্রাণীর চোখদুটো জ্বলজ্বলে সবুজ, দেখলেই মনে হয় যেন হিংস্রতার প্রতীক। তার উপরে তার শরীর থেকে বিচ্ছুরিত জ্যোতি তাকে আরও ভয়ানক করে তুলেছে।

হলে তুমুল চাঞ্চল্য, আর সেটা যে চরম আতঙ্কের অভিব্যক্তি, তাতে কোনও সন্দেহ নেই।

সব গোলমাল ছাপিয়ে হাইনে চেঁচিয়ে উঠল মাইকে—'এইবার বিশ্বাস হয়েছে তো?'

সমস্বরে উত্তর এল—'হ্যাঁ, হ্যাঁ! এই জীবকে সরাও, অবিলম্বে সরাও।'

হাইনেই বোধ হয় যন্ত্রের সুইচটা বন্ধ করে দিল, আর সঙ্গে সঙ্গেই ঘরের বাতি জ্বলে উঠল।

দর্শকদের মধ্যে সাতজন লোক ভয়ে অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিল। সামনের সারির একজন কালো সুট পরা ভদ্রলোক চেয়ার থেকে মেঝেতে পড়ে গেছেন।

কাছে গিয়ে দেখলাম, লোকটি প্রোফেসর শুল্‌ৎস।

ক্রোল শুল্‌ৎসের কবজি ধরে নাড়ি দেখে গম্ভীরভাবে বলল, 'ইনি আর বেঁচে নেই।'

এদিকে এই মৃত্যুর পশ্চাৎপটে চলেছে তুমুল করধ্বনি।

মনে মনে বললাম, 'কম্পিউডিয়ামের জয়, বিজ্ঞানের জয়।'

আনন্দমেলা। পূজাবার্ষিকী ১৩৯৪

